ম্যাজিক রিয়েলিজম: প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের পরিপ্রেক্ষিতে একটি তুলনামূলক পাঠ

হাজেরা মুন্নী হান[1]

সারসংক্ষেপ

১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয় গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের *নিঃসঙ্গতার একশ বছর*। ম্যাজিক রিয়েলিজমের নির্যাসকে অবলম্বন করে রচিত এই উপন্যাস ১৯৮২ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার অর্জন করে। বুয়েন্দিয়া পরিবারের ১০০ বছরের ইতিহাসের সমান্তরালে উদ্ভাসিত হয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার দীর্ঘ ইতিহাস(যুদ্ধ, ঔপনিবেশিক শাসন প্রভৃতি), নিজস্ব বিশ্বাস, সংস্কৃতি, রূপকথা প্রভৃতি। দক্ষিণ আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলে সংঘটিত কলা কোম্পানির গণহত্যা, হাজার দিনের যুদ্ধ, গেরিলা অভ্যুত্থান, মাকোন্দোয় রেললাইনের আবিষ্কারের চাইতে এখানে অধিকতর বাস্তব হয়ে ওঠে বুয়েন্দিয়া পরিবারের উরসুলার শত আয়ু(যেকিনা বুয়েন্দিয়াদের ৭টি প্রজন্মের পরিণতির সাক্ষী), শূকরের লেজসহ সন্তান জন্মদান এখানে স্বাভাবিক বিষয়, রাণী হবার প্রতিযোগিতা, হাজার দিনের বৃষ্টি কিংবা সুন্দরী রেমেদিওসের রূপের অনলে বৃথাই আত্মাহুতি দেওয়া প্রণয়পিপাসুরা অথবা প্রকাশ্য দিবালোকে সুন্দরী রেমেদিওসের আকাশে মিলিয়ে যাওয়া। ম্যাজিক রিয়েলিজমের মোড়কে পরিবেশিত এই উপন্যাসে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়কে হাজির করা হয়েছে বিশ্বাসযোগ্য হিসেবে উপস্থাপন করার জন্য। আবার, ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *খোয়াবনামা* উপন্যাসে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ থেকে দেশভাগ ও দেশভাগের পরে অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি বর্ণিত হয়েছে ম্যাজিক রিয়েলিজমের আঙ্গিককে অবলম্বন করে। খোয়াব বা স্বপ্ন ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারেনা। স্বপ্নের হাতছানিতে মানুষ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় ছুটে চলে প্রতিনিয়ত। কিন্তু, তমিজের মতো বিপন্ন মানুষের সেই আরাধ্য স্বপ্নগুলো অধরাই থেকে যায়। ফলে দেখা যায়, তেভাগা আন্দোলন, দেশভাগ, পলাশীর যুদ্ধ, সিপাহি বিদ্রোহ, ফকির বিদ্রোহ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনার সংমিশ্রণ ঘটেছে *খোয়াবনামা*'য়। নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানসের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, সংগ্রাম, স্বপ্নভঙ্গ, গ্রামীণ ও শহুরে জীবনের রাজনৈতিক প্রতিঘাত এসবকিছুর প্রতিভূ হিসেবে পাই তমিজ, তমিজের বাপ, চেরাগ আলী ফকির, বাঘার মাঝি, কুলসুম, শরাফত মণ্ডল, কেরামত, ফুলজান ও বৈকুণ্ঠকে। এরই সমান্তরালে দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশত্যাগ, রিফিউজি আগমন, তেভাগা আন্দোলনের বিবরণ উপন্যাসের ৫৯ টি পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। এই গবেষণাকর্মে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের এই দুই সাহিত্যকর্মে ম্যাজিক রিয়েলিজমের প্রয়োগের সাথে লাতিন আমেরিকা ও বাংলা ভূ-খণ্ডের ইতিহাসকে অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা রয়েছে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ: ম্যাজিক রিয়েলিজম, প্রাচ্য, পাশ্চাত্য, *খোয়াবনামা*, *নিঃসঙ্গতার একশ বছর*

এক

ম্যাজিক রিয়েলিজম বা জাদু বাস্তবতা একটি বহুল আলোচিত কনসেপ্ট, এর ব্যবহার দেখা যায় সাহিত্যে, শিল্পকলা ও চলচ্চিত্রে। জার্মান *Magischer Realismus* আখ্যাটি তৈরি করা হয় চিত্রকলা সূত্রে ১৯২০- এর দশকে, যে চিত্রে আপাত বাস্তবের অন্তরালে জীবনরহস্যকে ধরার প্রয়াস ছিল। ১৯১৯-২৩ এই সময়ে দেখা যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের কারণে চূড়ান্ত অর্থনৈতিক দুরবস্থা, ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি, বাম–ডান বিপ্লবী দলগুলো যুদ্ধ করছে, বিচ্ছিন্নতাবাদী ও বিপ্লবী কার্যকলাপে তৈরি হয়েছে জাতীয় সংকট, কোয়ালিশন সরকার তা প্রশমিত করতে ব্যর্থ। জার্মানির অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, দেশময় কোনোক্রমে বেঁচে থাকার মনোভাব যখন ক্রমাগত বাড়ছে, তখন এই পরিস্থিতিতে শিল্পীরা সুভদ্র বস্তুগত বিচার ও প্রকাশবাদী মানবিকতা এবং যুক্তিবিচারে আস্থা না রাখতে পেরে দ্বিধান্বিত, শঙ্কিত। এই অবস্থায় জার্মান শিল্প সমালোচক ফ্রাঞ্চ রো ভাইমার ম্যাজিক রিয়েজমের কনসেপ্ট প্রদান করেন। পরবর্তীকালে ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, ইতালি, আমেরিকাতে ম্যাজিক রিয়েলিজমের বিস্তার ঘটে।[২]

---

[1] *হাজেরা মুন্নী হান। শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সাভার ঢাকা ১৩৪২।

ম্যাজিক রিয়েলিজমের উদ্ভবের বিষয়ে আলোকপাত করলে দেখতে পাই, উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ইউরোপীয় সাহিত্যে রিয়েলিজমের তত্ত্ব ও আঙ্গিকের ব্যবহার দেখা যায়। যার উদ্দেশ্য ছিল জীবন ও সমাজের বাস্তবচিত্রের পরিবেশনা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে অভিব্যক্তিবাদ বা এক্সপ্রেশনিজমের সূচনা, যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্য বা চিত্রকলায় বাহ্যিক জীবনের চাইতে অভ্যন্তরীণ জীবনের মর্মোদ্ধার। পরবর্তীকালে ১৯১৫ সালে রোমান কবি ত্রিস্তান ও জার্মান লেখক হুগো বল বুর্জোয়া শিল্প-সংস্কৃতি বিরোধী এক নৈরাজ্যবাদী আন্দোলন শুরু করেন যা 'ডাডাবাদ' নামে পরিচিত। প্রথাগত জীবনযাত্রা, ধর্মচেতনা, নীতি ও সৌন্দর্যবোধ ইত্যাদি সবকিছু ভেঙেচুরে ফেলাই ছিল ডাডাবাদীদের লক্ষ্য। ১৯২২ সালের দিকে ডাডাবাদ স্তিমিত হয়ে পড়লে দুই ডাডাবাদী ব্রেতঁ ও আরাগঁ শুরু করেছিলেন সুররিয়ালিজমের। যুক্তিশাসিত প্রত্যক্ষ বাস্তবতার সীমা পেরিয়ে মগ্নচেতনার যে এক পরাবাস্তব জগৎ রয়েছে তার গভীর রহস্যকে উদঘাটন করাই ছিল সুররিয়ালিস্ট চিত্রকলা, কবিতা ও চলচ্চিত্রের উদ্দেশ্য। স্বপ্ন ও বাস্তবের প্রচলিত বিরোধিতা নাকচ করে সুররিয়ালিস্টরা এমন এক বাস্তবের কথা বলেন যেখানে চিন্তা, কল্পনা, স্বপ্ন ইত্যাদি মিলেমিশে যায়। আবার দেখা যায়, ১৯২৫ সালে জার্মান শিল্প-সমালোচক ফ্রাঞ্চ রো ম্যাজিক রিয়েলিজম অভিধাটি প্রথম ব্যবহার করেন, বাস্তবতাকে বোঝাতে। ১৯৪৯ সালে সুররিয়ালিজম আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকা কিউবার ঔপন্যাসিক আলেহো কার্পেন্তিয়ার *On The marvelous Real in America* প্রবন্ধে বলেন: "Afterall- what is the entire history of America if not a chronicle of the marvelous real?" এই marvelous real হলো বাস্তবতার এক ভিন্ন রূপ, যা বাস্তব ও কুহক কল্পনার এক আশ্চর্য মিশ্রণ। বস্তুনিষ্ঠ-বাস্তবনির্ভর আখ্যানের ভিতরে অবিশ্বাস্য অধিবাস্তব ঘটনার উপস্থিতি, স্বপ্ন-রূপকথা-পুরাণ-লোকগাথা ইত্যাদির ঐন্দ্রজালিক উপস্থাপন।[২]

ম্যাজিক রিয়েলিজম বা জাদুবাস্তবতা অভিধার জন্ম ইউরোপে হলেও সাহিত্য ভাবনা বা শৈলী হিসেবে ম্যাজিক রিয়েলিজমের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল লাতিন আমেরিকায়। সাহিত্যে ম্যাজিক রিয়েলিজমের নিখুঁত প্রয়োগ দেখা যায় লাতিন আমেরিকার সাহিত্যে। জাদু বাস্তবতা কেন্দ্রিক সাহিত্যে দেখা যায় আধিপত্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে প্রান্তিক মানুষের লড়াই। আমরা দেখতে পাই, আধিপত্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে উত্তর-ঔপনিবেশক পর্বের প্রান্তিক মানুষের সংগ্রাম। একটি রাজনৈতিক পটভূমির মধ্যে সেই অঞ্চলের সর্বস্তরের মানুষের ভাগ্য ফুটে উঠতে থাকে। বিশ্বে যেখানেই ঔপনিবেশিকতার পদচিহ্ন পড়েছে সেখানেই উপনিবেশবাদী সংস্কৃতির মেলবন্ধনে সৃষ্টি হয়েছে ম্যাজিক রিয়েলিজমের পোস্টকলোনিয়াল ডিসকোর্স। লাতিন আমেরিকায় ম্যাজিক রিয়েলিস্ট সাহিত্য জন্ম নেবার কারণ মোটাদাগে দুইটি:

১। স্পেনের অধীনে ১৫৯২ থেকে ১৮১৯ পর্যন্ত দীর্ঘ ২২৭ বছরে লাতিন আমেরিকা ঔপনিবেশিক কদর্যতার এক প্রশস্ত লীলাভূমি হয়ে উঠেছিল। ইউরোপীয় লাঞ্ছনা ও নিগ্রহের বিরুদ্ধে একমাত্র পথ ছিল প্রতিবাদ-শাণিত বিদ্রূপ। ম্যাজিক রিয়েলিজমের মাধ্যমে প্রতিবাদের এই পথটি সুগম হয়েছে।

২। লাতিন আমেরিকা হয়ে উঠেছিল স্পেনীয়, রেডইন্ডিয়ান, আফ্রিকান প্রভৃতি জাতি-উপজাতির মানুষের আবাসভূমি। ক্রীতদাস কিংবা পেটের দায়ে আসা এইসব মানুষেরা তাদের নিজস্ব উপকথা, কল্পকাহিনি, ধর্মীয় বিশ্বাস, রূপকথা প্রভৃতি নিয়ে এসেছিল নিজেদের সাথে। যেগুলোর মাধ্যমে তাদের সমাজ ও রাজনীতির অত্যাচার-অনাচার-উৎকেন্দ্রিকতা উঠে আসে। ফলে, ম্যাজিক রিয়েলিজমে রূপকথা, উপকথাকে হাজির করা হয় সত্যকে উদঘাটন করার জন্য।[৩]

জাদু বাস্তবতা কথাটি মূলত বিপরীতধর্মী। জাদু বাস্তবতায় জাদু কথাটির নানান অর্থ আছে। জাদু বলতে সাধারণত আমরা বুঝি অলৌকিক ঘটনা, অবাস্তব বিষয়, মানুষজনের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া। কিন্তু জাদু বাস্তবতায় জাদুকে ব্যবহার করা হয় মূলত বাস্তবতাকে বোঝাতে। জাদু বাস্তবতায় জাদু কথাটি জীবনরহস্য অর্থেই আসে, ভূতের আবির্ভাব, লোকজনের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, অলৌকিক ব্যাপার, অসাধারণ ক্ষমতা, অদ্ভুত আবহ, এসবকিছুই আনা হয় বাস্তবতাকে বোঝানোর জন্য। জাদুর খেলা কিংবা জাদুর কারসাজির সাথে জাদু বাস্তবতার কোনো সম্পর্ক নেই।

জাদু বাস্তবতায় থাকে সামষ্টিক চিন্তা, সাধারণ মানুষের বঞ্চনার করুণ গাথা। লেখক যখন সাধারনভাবে তাঁর লেখাটিকে ফুটিয়ে তুলতে অপারগ হন, পরিবেশ পরিস্থিতির কবলে পড়ে তিনি বাধ্য হন নতুন কোনো শিল্প আঙ্গিককে অবলম্বন করতে। মূলত, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই মানুষের চিন্তা জগতে বিপুল পরিবর্তনের কারণে

ডাডাবাদ, প্রতীকবাদ, অস্তিত্ববাদ, প্রকৃতিবাদ, পরাবাস্তববাদ, জাদু বাস্তববাদ প্রভৃতি শিল্প আন্দোলনগুলোর উদ্ভব হয়েছে। বিশ্বযুদ্ধের ফলে যন্ত্রসভ্যতার নগ্ন উত্থান, অমানবিকতা, যুগ যন্ত্রনার যে অমোঘ বাণী বিশ্ববাসী শুনতে পেয়েছিল তাতে করে এই শৈল্পিক তত্ত্বগুলো মানুষের মনোজগৎ ও বহির্জগতকে রূপদানের প্রয়াস চালায় (যেমন: স্যামুয়েল বেকেটের *ওয়েটিং ফর গডো*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *রক্তকরবী*, ফ্রাঞ্জ কাফকার *মেটামরফোসিস*, জেমস জয়েসের *ইউলিসিস* প্রভৃতি)। ম্যাজিক রিয়েলিজমের আলো-আঁধারময় পরিবেশে লেখকের মূলত প্রকৃত ইতিহাসকে বের করার প্রবণতা থাকে। মহাশ্বেতা দেবী ইতিহাস সম্পর্কে বলেন, "আমি একটু ভিন্নভাবে ইতিহাস খুঁজি। দুটো প্রিন্টেড লাইনের মাঝখানে যে সাদা জায়গা-আমি মনে করি সেখানেই প্রকৃত ইতিহাসটা লুকিয়ে থাকে। মহাকাব্য পুরাণ ঘাঁটলে নানা ধরনের অসঙ্গতি-অন্যায়ের দেখা মেলে।"[৪]

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *খোয়াবনামা* উপন্যাসে বিবৃত হয়েছে ১৭৫৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সালের দেশভাগ পর্যন্ত সময়। ঔপন্যাসিক এই দীর্ঘকাল পর্বে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, পলাশীর যুদ্ধ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, পাকিস্তান আন্দোলন, জমিদারী প্রথা ও তেভাগা আন্দোলন, মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের রাজনীতি- প্রভৃতির সম্মিলনে ভারতবর্ষের প্রায় দুইশত বছরের ইতিহাসের সাথে কাৎলাহার, গিরিডাঙ্গার, নিজগিরিডাঙ্গার অধিবাসীদের জীবনালেখ্যকে হাজির করেছেন। মিথ-প্রতীক, রূপকথা আর স্বপ্নের ব্যাখ্যার মাধ্যমে নিম্নবর্গের ইতিহাসকে ধরার প্রয়াস চালিয়েছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস।

আবার দেখা যায়, লাতিন আমেরিকার ইতিহাস, ভূগোলকে এক করে স্বপ্ন, মিথ, প্রতীক, রূপকথা প্রভৃতির সম্মিলনে গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ রচনা করেন তাঁর অমর আখ্যান *নিঃসঙ্গতার একশ বছর*। ঠাকুমার কাছে শোনা রূপকথার বিভিন্ন গল্পের মধ্য দিয়ে তিনি লাতিন আমেরিকার ইতিহাসকে ধরতে চেয়েছেন। উরসুলা ইগুয়ারান ও হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার মাধ্যমে লাতিন আমেরিকার মাকোন্দো অঞ্চলের কাহিনি, মিথ, বিশ্বাস, রাজনীতিকে হাজির করেছেন। বুয়েন্দিয়া পরিবারের ১০০ বছরের ইতিহাসের সমান্তরালে লাতিন আমেরিকার ইতিহাস উঠে এসেছে। উরসুলা ও হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার দুই ছেলে ও এক মেয়ে যথাক্রমে হোসে আর্কাদিও, কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া ও আমারান্তা ; একটি পারিবারিক আবহে গল্প শুরু হলেও সেটি আর পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, এরমধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটেছে জিপসিদের(এদের মধ্য দিয়েই বৈশ্বিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, কলাকৌশলের সাথে পরিচয় ঘটে মাকোন্দোবাসীর) কলা যুদ্ধ, হাজার দিনের বৃষ্টি, হাজার দিনের যুদ্ধ, সমাজতান্ত্রিক দলের উত্থান, ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব, মাকোন্দোর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়।

পরাবাস্তবতা ও জাদু বাস্তবতায় একটি সাধারণ বিষয় হলো 'বাস্তবতা'। যুক্তির অনুশাসনের বাইরে মগ্নচৈতন্যের যে অধিবাস্তব জগৎ রয়েছে সেখানে অবগাহন করে তার অতল রহস্যকে যথাযথভাবে উদ্‌ঘাটিত করাই ছিল সুররিয়ালিস্ট আন্দোলনের লক্ষ্য। স্বপ্নে যেমন অর্ধচেতন ও অবচেতনের জগৎ ধরা পড়ে এলোমেলো চিত্র ও কল্পনায়, তেমনি বাস্তবের প্রকাশের জন্য তাকে চেতন মনের যুক্তি-পারম্পর্য নিরপেক্ষ স্বতঃব্যক্ত রচনা হতে হবে। ফলে, স্বপ্নের মতোই প্রতীকের মাধ্যমে মগ্নচৈতন্যকে প্রতিফলিত করা বা যুক্তির পরিবর্তে আবেগকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন সুররিয়ালিস্ট কবি ও শিল্পীরা। অন্যদিকে, জাদু বাস্তবতায় লেখকের মগ্নচৈতন্যের চেয়ে একটি ভূখণ্ডের সামষ্টিক চেতনা প্রধান হয়ে উঠে। নিপীড়িত মানুষের ভাগ্য ফুটে উঠতে দেখা যায় এই আখ্যানের পরতে পরতে। পরাবাস্তবতায় চেতন ও অবচেতনের মেলবন্ধন থাকে যা ব্যক্তিহৃদয় থেকে উৎসারিত হয়, অন্যদিকে জাদু বাস্তবতায় থাকে সামষ্টিক চেতনা। ফলে, *খোয়াবনামা*'য় দেখি ক্ষুধার যন্ত্রনায় কাতর ফুলজান ও তার মেয়ে কাৎলাহার বিলে চাঁদের নিচে জোনাকির আলোর জ্বালে চাঁদের ওপর আউশের রাঙা চাল সেদ্ধ হবার দৃশ্য দেখার মতো মতিভ্রম হয় তাদের। ধোঁয়া-ওঠা বলকানো ভাতের গন্ধ শোঁকে কিছুক্ষণের জন্য ক্ষুধার যন্ত্রণাকে ধামাচাপা দিতে চায়। জাদু বাস্তবতা অনুসারী লেখক যখন নিপীড়িত মানুষের ভাগ্যকে এক সুতোয় গাঁথার দুঃসাহসিক কাজ করেন, সুররিয়ালিস্ট লেখক তখন চাঁদের আলোয় নিজস্ব ভাবনায় মগ্ন থাকেন। আপন স্বপ্নময় মগ্নচৈতন্যের অনুভবগুলোকে এক আশ্চর্য স্বতঃস্ফূর্ততায়, প্রতীক ও চিত্রকল্পের সখ্যতায়, বাস্তবতা ও ফ্যান্টাসির মেলবন্ধনে, আদিম-অবাধ-অকৃত্রিম স্বপ্নলোককে রূপায়িত করে পরাবাস্তববাদী রীতিতে জীবনানন্দ দাশ বলেন:

স্বপ্নের ভিতর বুঝি-ফাল্গুনের জ্যোৎস্নার ভিতরে
দেখিলাম পলাশের বনে খেলা করে
হরিণেরা; রুপালি চাঁদের হাত শিশিরে পাতায়,
বাতাস ঝাড়িছে ডানা-মুক্তা ঝরে যায়।[৫] (হরিণেরা)

ম্যাজিক রিয়েলিজমের আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যের দিকে তাকালে দেখতে পাই, লেখক প্রকৃতিতে বা মানব আচরণে খুঁজে চলেন এক লুকানো ক্ষমতা, শক্তি, রহস্য। কেন্দ্রিয় ঘটনাগুলোর কার্য-কারণগত কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়না। সময় এখানে তাড়াতাড়িই গতিপথ পরিবর্তন করে ফেলে। কল্পনা, বাস্তব, উদ্ভট যেন পাশাপাশি অবস্থান করে। বাস্তব এখানে ভাঙা, রদ বদলের মধ্য দিয়ে পাঠক প্রয়োজনীয় সত্যে পৌঁছে যায়। স্বপ্ন, মিথ, রূপকথার পারস্পরিক মিশ্রণ দেখা যায়। এ ধরনের রচনায় থাকে মহাকাব্যিক মাত্রা(*খোয়াবনামা*, *নিঃসঙ্গতার একশ বছর* প্রভৃতি)। অনেক সময় এক কাল্পনিক অঞ্চল থাকে আর এর আখ্যানে সেই অঞ্চলের মানুষের চূড়ান্ত ভাগ্য ফুটে উঠতে দেখা যায়। জাদুবাস্তববাদী রচনায় উত্তর-ঔপনিবেশিক প্রসঙ্গকে উপনিবেশকারী এবং উপনিবিষ্ট- এ দুয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করতে পারেন লেখক। উপনিবিষ্টের দৃষ্টিকোণ থেকে হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস, স্বর, মিথ প্রভৃতি পুনরুদ্ধারের একটা প্রবণতা থাকে। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "বাস্তবের কুহক আর কুহকের বাস্তব" বইতে ম্যাজিক রিয়েলিজমের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলেছেন যে, "উপন্যাসের গড়ন যতই আঁটসাঁট আর সংযত হোক না কেন, এখানে কোনো একটি মাত্র আখ্যান সরলরেখা ধরে এগোয়নি। সেই অর্থে নেই তার সূচনা, মধ্যবর্তী সংঘাত ও জটিল গোলকধাঁধা, এবং তারপরে সব ধাঁধা, হেঁয়ালি ও সংঘর্ষের নিরসন, অর্থাৎ কোনো একটি মাত্র প্লট উপন্যাসে নেই।" মোটাদাগে, জাদু বাস্তব রচনায় নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যায়:

পারিপার্শ্বিকতা: জাদু বাস্তবতায় গল্পের পটভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। যেকোন বাস্তব কিংবা কল্পিত জায়গায় পটভূমিতে গড়ে উঠতে পারে। তবে, বেশির ভাগ গল্প লেখা হয়েছে গ্রামীণ বা ছোট শহরের পারিপার্শ্বিকতাকে অবলম্বন করে। *নিঃসঙ্গতার একশ বছর* উপন্যাসে আমরা মাকোন্দো নামক কাল্পনিক নগরের প্রসঙ্গ পাই, যার অবস্থান বলা হয়েছে কলম্বিয়ার ক্যারিবিয়ান উপকূলে।

গল্পের চরিত্র: দৈনন্দিন জীবন থেকে বেছে নেয়া সাধারণ গড়পরতা মানুষেরাই হবেন জাদুবাস্তব গল্পের চরিত্র। এমন মানুষজন যাদের সাথে পথেঘাটে চলার সময় দেখা হয়ে যায়। তারা শুধুই মানুষ- আটপৌরে, সহজসরল। তাই বলে তারা বৈশিষ্ট্যহীন মানুষ হবেন না। প্রত্যেকের মধ্যেই এক ধরণের স্বকীয়তা থাকবে।'*খোয়াবনাম*'য় দেখা যায় কুলসুমের স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেবার অদ্ভুত ক্ষমতা রয়েছে।

অদ্ভুত বা চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য: বলাবাহুল্য, জাদুবাস্তব গল্পের অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে অদ্ভুত বা চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য। সেটা সময়, স্থান বা চরিত্রের মধ্যে মিশে থাকতে পারে। এ বৈশিষ্ট্য ছাড়া গল্প হয়ে পড়বে নিছক বাস্তব ঘটনার বিবরণমাত্র। যেমন- *নিঃসঙ্গতার একশ বছর* উপন্যাসে শূকরের লেজ বিশিষ্ট সন্তান জন্মদানের প্রসঙ্গ পাই।

প্লট: জাদুবাস্তব কাহিনির মূল বৈশিষ্ট্য হলো এতে দৈনন্দিন ঘটনাবলী এমনভাবে তুলে ধরতে হবে, যাতে অসাধারণ সব ঘটনা ঘটতে থাকবে। সেটা আবার বড় বড় ঘটনার বর্ণনা নয়, যেসব ঘটনা জীবন বা ইতিহাসের বাঁক ফিরিয়ে দেয়। প্লটের বিভিন্ন অংশ একত্রিত হয়ে গোলক ধাঁধায় আপতিত হয়। মূল কাহিনির সাথে অসংখ্য শাখা কাহিনি থাকে।

সময়: ম্যাজিক রিয়েলিজমে গল্প বলার সময় হঠাৎ 'সময়' থমকে দাঁড়াবে, আবার তা চলতে আরম্ভ করবে। জাদু বাস্তবতার গল্পে সময়কে জলের স্বভাবে পেয়ে বসে। সময় এখানে সরলরেখা ধরে প্রবাহিত হয় না। লেখক অতীত থেকে ভবিষ্যতে চলে যান নির্বিঘ্নে, এমনকি ভবিষ্যত থেকে বর্তমানে চলে আসতে পারেন নির্বিশঙ্কায়।

স্বর ও আবহ: আলবার্তো রাইও'র মতে জাদুবাস্তবতায় গল্প বলার স্বরভঙ্গিটিই সব। অসাধারণ ঘটনার বর্ণনা দেয়া হয় অতিসাধারণ ভাষায়, কোন বিস্ময়সূচক যতিচিহ্ন ব্যবহার করা হয় না। বিষয়টা যখন বিশাল তখন তা বলা হয় নিচু স্বরে, ঘটনা যখন তুচ্ছ তখন তার বর্ণনা দেয়া হয় বিরাট আয়োজনের সাথে। এইসব মিলিয়ে পুরো উপন্যাসে বর্ণনার জন্য একটা স্বর ঠিক করে নেয়া হয়, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সে আবহটা বজায় থাকে।

সাহিত্যিক স্টাইল: জাদুবাস্তবতার গল্প বিশেষ সাহিত্যিক স্টাইলে লেখা হয়। ম্যাজিক রিয়েলিজমে বর্ণনার জন্য অদ্ভুত সুন্দর ভাষা ব্যবহার করেন সাহিত্যিক, যার শৈলী ও শিল্পরূপ পাঠক মনে ইন্দ্রজাল বিস্তার করে। একটা সাদামাটা গল্পকে জাদুবাস্তব গল্পে এমনভাবে বলা হয় সেটা সত্যিকারের বিশেষ ধরণের গল্পে পরিণত হয়। এতে প্লটের চেয়ে ভাষা আর স্টাইলের ওপর বেশি জোর দেয়া হয়। মার্কেজ যেমন গল্প বলার সময় তাঁর দাদীর গল্প বলার স্টাইল অনুসরণ করেছেন।

বাকসংযম: জেই আর্চার ডেভিসের মতে, 'গল্পের টেক্সটে বর্ণিত ঘটনাকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য কথক কোন ব্যাখ্যা যুক্ত করেন না। কথক এক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিক দূরত্ব বজায় রাখেন। গল্প এগিয়ে চলে যুক্তির স্পষ্টতার পথ ধরে, যেন অন্যরকম কোন ঘটনাই ঘটেনি।' কি ঘটতে চলেছে সেটা গল্পের চরিত্ররা বা কথক পাঠকের চেয়ে বেশি জানবেন না। ঘটনার সাথে সাথে বিষয়গুলো চরিত্রদের কাছে পর্যায়ক্রমে খোলাসা হবে। লেখকের বাকসংযম হলো সেটা, যখন লেখক গল্পের পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কিত তথ্য নিজের কাছে রেখে দিয়ে পাঠককে ইচ্ছাকৃতভাবে অস্পষ্টতার ভেতর রেখে দেন। ফলে গল্পের মধ্যে এক ধরণের চমকের সৃষ্টি হয়। লেখক, চরিত্র আর পাঠকদেরকে আঁধারে রেখে গল্পের মধ্যে একটা সদাপ্রবহমান রহস্যময়তা রেখে দেন।

অভ্যন্তরীণ যুক্তি-শৃঙ্খলা: ম্যাজিক রিয়েলিজমের গল্পে কখনো জাদুর কোন ব্যাখ্যা থাকেনা। তাই গল্পের চরিত্ররা যে দুনিয়ায় বাস করে সেখানে সদাঘটমান রহস্যময় কাণ্ডকারখানার মধ্যে একটা অভ্যন্তরীণ যুক্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে হয় গল্পের সামগ্রিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য। স্বভাবতই জাদুর মধ্যে যুক্তির ঠাঁই নেই। তাই পুরো গল্পকে একটা মূল কাঠামোর আওতায় রাখার জন্য একটা যৌক্তিক শৃঙ্খলা রাখতে হয়, যাতে ঘটনাবলী পরস্পরবিরোধী না হয়।[৬]

গার্সিয়া মার্কেজ এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "যখন আপনি বলবেন, হাতি আকাশে উড়ছে, মানুষ আপনাকে বিশ্বাস করবে না। কিন্তু আপনি যদি বলেন, ৪২৫টি হাতি আকাশে উড়ছে। লোকজন আপনাকে বিশ্বাস করলেও করতে পারে।"[৭] ফলে, ম্যাজিক রিয়েলিজমে অস্বাভাবিক ঘটনা এমনভাবে বর্ণিত হয় যে, পাঠক তাতে আশ্চর্য হলেও গল্পের চরিত্ররা তাতে বিন্দুবিসর্গ আশ্চর্য হয়না। আবার, অবাস্তব ঘটনাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনার প্রয়োজন হয়, যাতে পাঠক ঘটনাটির সত্যতা সম্পর্কে সন্দিহান হন। *নিঃসঙ্গতার একশ বছর*, *খোয়াবনামা*'তে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনার ফলে এক মহাকাব্যিক মাত্রা পাওয়া যায়।

দুই

নিঃসঙ্গতার একশ বছরে দেখা যায় মাকোন্দো(একটি কল্পিত অঞ্চল, যার সত্যতা দক্ষিণ আমেরিকায় পাওয়া যায়নি)একটি সুখী অঞ্চল ছিলো যেখানে বিগত ৩০ বছরে কেউই মারা যায় নি। আর সেখানে ৩০ বছরের চেয়ে বেশি বয়সের কেউ ছিলনা। বুয়েন্দিয়া পরিবারের ১০০ বছরের ইতিহাসের সাক্ষী একদিকে যেমন উরসুলা, তেমনি অন্যদিকে পিলার তারনেরা বুয়েন্দিয়া পরিবারের সাতটি প্রজন্মের যৌনতার সাক্ষী। পরিবারের বড় ছেলে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া থেকে এই যৌনতার সূত্রপাত। আবার, একই পরিবারের না হলেও বোনের সম্পর্ক দেখা যায় আমারান্তা আর রেবেকার মধ্যে। অথচ পিয়েত্রি ক্রেসপিকে ঘিরে তাদের মধ্যে দা-কুমড়া সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। যার ফলে, যৌনপ্রতিহিংসার কারণে আমৃত্যু তারা একে অন্যের মুখ দেখেনি। অবাধ যৌনতা যেন শেষ পর্যন্ত বুয়েন্দিয়া পরিবারের চরম পরিণতির জন্য দায়ী। দেখা যায়, সর্বশেষ প্রজন্ম অরেলিয়ানো ব্যাবিলনিয়া তার আপন খালা আমারান্তা উরসুলার সাথে অজাচারে লিপ্ত হয়ে শূকরের লেজবিশিষ্ট একটি পৌরাণিক জন্তুর জন্ম দেয়। যার ব্যাপারে উরসুলা প্রথম থেকেই সতর্কবাণী দিয়ে এসেছিল। পৌরাণিক জন্তু জন্মানোর মিথকে এখানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উপস্থাপন করা হয়েছে, যা কিনা ম্যাজিক রিয়েলিজমের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার মৃত্যুকে ঘিরে মাকোন্দোয় যে ধোঁয়াশার জন্ম হয়েছিলো, তা মাকোন্দোর অমীমাংসিত রহস্য। রেবেকা আর হোসে আর্কাদিও উরসুলার পরিবার থেকে বেরিয়ে সুখী দাম্পত্য জীবন কাটালেও কিছুদিনের মধ্যেই হোসে আর্কাদিওর বুলেট বিদ্ধ লাশ তার বাড়িতেই পাওয়া যায়। রেবেকা জানায় তার স্বামী যখন বাসায় আসে তখন সে ছিটকিনি বন্ধ করে গোসলখানায় ছিলো। রেবেকার কথা বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু মাকোন্দোয়

হোসে আর্কাদিওর কোনো শত্রু ছিলোনা, আবার বাড়িতে রেবেকা ও তার স্বামী ছাড়া আর কেউই ছিলোনা অন্যদিকে, সে রেবেকাকে সুখেও রেখেছিলো। ফলে, রেবেকার চেয়ে বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনা পাওয়া সম্ভবও ছিলোনা। (এখানে বলা বাহুল্য, পিয়েত্রে ক্রেসপিকে বিয়ে করতে আমারান্তা অস্বীকৃতি জানালে রেবেকাও যেন তার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে হুট করেই হোসে আর্কাদিওকে বিয়ে করে ফেলে)উরসুলার কাছে হোসে আর্কাদিওর মৃত্যুর সংবাদ পৌছায় জাদু বাস্তব রীতিতে, রক্তের স্রোত যেন উরসুলার দিকে ধাবিত হয়ে তার পুত্র হত্যার জানান দেয়, আর সেই সাথে পাঠক বুঝে যায় তার মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়। ঔপন্যাসিক লিখেছেন:

> দরজার নিচ দিয়ে বেরিয়ে আসে রক্তের একটা ধারা, পার হয়ে যায় বসার ঘর, বেরিয়ে যায় রাস্তায়, উঁচুনিচু চত্বরগুলোর ওপর দিয়ে আড়াআড়ি চলতে থাকে একটা সরলরেখা তৈরি করে, নেমে যায় সিঁড়ির ধাপগুলো বেয়ে, উঠে পড়ে বেড়ার ওপর, তুর্কীদের সড়ক ধরে এগিয়ে চলে, এক কোনায় এসে ঘুরে যায় ডান দিকে, তারপর বাঁয়ে, বুয়েন্দিয়াদের বাড়ির কাছে এসে একটা সমকোণ তৈরি করে ভেতরে ঢুকে পড়ে বন্ধ দরজার নিচ দিয়ে মাদুরে যাতে দাগ না লাগে সেজন্যে দেয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে বৈঠকখানা পেরিয়ে যায়, পড়ে গিয়ে আরেক বৈঠকখানায়, খাবারঘরের টেবিলটা এড়ানোর জন্যে বেমাক্কা রকমের একটা বাঁক নেয়, বেগনিয়াভরা বারান্দা ধরে এগিয়ে চলে গড়িয়ে, অরেলিয়ানো হোসেকে পাটিগণিত শেখানোয় ব্যস্ত আমারান্তার অলক্ষ্যে চলে যায় চেয়ারের নিচ দিয়ে, ভাঁড়ার ঘর পেরিয়ে, তারপর বেরিয়ে আসে রান্নাঘরে, যেখানে রুটি তৈরি করার জন্যে ছত্রিশটা ডিম ভাঙ্গার জন্যে তৈরি হচ্ছিল উরসুলা।[৮]

হোসে আর্কাদিওর বারুদ বিদ্ধ লাশ হতে হাজারো চেষ্টার পরেও বারুদের গন্ধ মুছে ফেলা যায় না । এমনকি তার কবর থেকেও বারুদের গন্ধ ক্রমাগত বেরিয়ে মাকোন্দোবাসীকে তার অপমৃত্যুর নালিশ যেন জানাতে থাকে। হোসে আর্কাদিওর রক্তের স্রোত বিভিন্ন বাঁক অতিক্রম করে রান্নাঘরে তার মা উরসুলার কাছে হাজির করার যে চিত্রটি মার্কেজ এঁকেছেন সেটি মূলত জাদু বাস্তব চিত্র। বর্তমানে চলচ্চিত্রে এরূপ চিত্রপটের বহুল প্রচলন দেখা যায়। একদিকে, হোসে আর্কাদিওর অপমৃত্যুর জন্য পাঠক রেবেকাকে দায়ী করতে পারেনা অন্যদিকে, তাকে ছাড়া অন্য কাউকে সন্দেহও করতে পারেনা। যৌন প্রতিহিংসার কারণে রেবেকা হোসে আর্কাদিওকে খুন করতে পারে এমন ধারণা পাঠকের মনে উদিত হলেও এর কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য বা নমুনা না থাকার কারণে এই মনোভাব উবে যেতে বেশি সময় লাগেনা। ফলশ্রুতিতে, পাঠকের মধ্যে এক ধরণের ধোঁয়াশার জন্ম হয়। ম্যাজিক রিয়েলিজমে এরূপ ধোঁয়াশা, আলো-আঁধারময় পরিবেশ অনবরত দেখা যায় এবং পাঠক এরই মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় সত্যের মুখোমুখি চলে যান। ফলে, পরবর্তীকালে রেবেকার অনুশোচনাময় জীবনের জন্য পাঠকের মনে করুণা সঞ্চারিত হয়।

তিন

ঔপনিবেশিক শাসকেরা কোনো ভূখণ্ডে তাদের শাসন করলে সেখানে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে থাকে। উনিশ শতকে ভারতবর্ষে স্থাপিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তরুণ ইংরেজ সিভিলিয়ানদের এদেশিয় ভাশা-সংস্কৃতি সম্পর্কে শিক্ষাদান করা। পরবর্তীকালে, এই কলেজে জ্ঞানশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখা চালু করা হলে এদেশিয় মানুষ পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিদ্যা লাভ করতে সমর্থ হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজদের জ্ঞান বিতরণের এই পন্থাকে প্রথমদিকে সমর্থন জানালেও ক্রমেই তাঁর ভুল ভাঙার প্রমাণ পাই কালান্তর প্রবন্ধে: "ক্রমে ক্রমে দেখা গেলো য়ুরোপীয় অনাত্মীয়মণ্ডলে, য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্য নয়, আগুন লাগাবার জন্যে।" ফলে, ঔপনিবেশিক শাসকেরা এদেশিয় সম্পদ পাচারের জন্য সহজ মাধ্যম হিসেবে রেললাইন স্থাপন করে, অন্যদিকে, উপনিবেশিত অঞ্চলের সাধারণ মানুষ যোগাযোগের সুবিধা লাভ করে সন্তুষ্ট থাকে। ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসনকে যদি দুইটি স্তরের সাথে চিন্তা করা যায়, তাহলে উপরের স্তরে থাকে রেনেসাঁ বা নবজাগরণ, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, পাশ্চাত্য জ্ঞান, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, সমাজ-সংস্কার; নিচের স্তরে থাকে সিপাহি বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, ডিভাইড এন্ড রুল পলিসি প্রভৃতি। ঠিক একই বিষয় দেখা যায় মাকোন্দোর মধ্যে। কলোম্বিয়াতে ঔপনিবেশিক শাসন চললেও শাসকগোষ্ঠী প্রণীত আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার সুবিধা মাকোন্দোর মতো প্রান্তিক অঞ্চলেও পৌছে যাবার চিত্র পাওয়া যায়। ফলে, মাকোন্দোর মতো অতি ক্ষুদ্র অঞ্চলে উরসুলার বাড়ীতে পৌঁছে যায় ভিয়েনার আসবাবপত্র, ওলন্দাজ টেবিল ক্লথ, ইন্ডিজ কোম্পানির বাসন-কোসন, পিয়ানো, ফনোগ্রাফ প্রভৃতি শোভা পেতে থাকে। মাকোন্দোয় স্থাপিত

হয় রেললাইন, সিনেমার সাথে পরিচিত হয় মাকোন্দবাসী। ঘরে ঘরে শোভা পেতে থাকে ফনোগ্রাফ। আবার, পিয়ানো বাজানোর কলাকৌশল শেখানোর জন্য কোম্পানি নিজ খরচে সঙ্গীত বিশেষজ্ঞকে (পিয়েত্রে ক্রেসপি) পাঠায়। গার্সিয়া মার্কেজ মাকোন্দোর এই ঘটনাগুলোর মেলবন্ধনে লাতিন আমেরিকায় বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশকে হাজির করেছেন। ঔপন্যাসিক লিখেছেন:

> এতোসব অসাধারণ আবিষ্কার দেখে চোখ ধাঁধিয়ে গিয়ে মাকোন্দোবাসীরা ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারে না কবে থেকে তাদের বিস্ময়ের শুরু হয়েছিল। ট্রেনটার দ্বিতীয় যাত্রায় অরেলিয়ানো ত্রিস্তে যে প্ল্যান্টটা নিয়ে এসেছিল সেটা থেকে শক্তি পাওয়া পাণ্ডুর বৈদ্যুতিক বাল্বগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে রাত কাবার করে দেয় তারা, তাছাড়া ট্রেনটার আচ্ছন্ন-করা টুম-টুম শব্দে অভ্যস্ত হতে বেশ খানিকটা সময় আর শ্রম ব্যয় করতে হয় তাদের।[৯]

মাকোন্দোর মতো শান্তিপ্রিয় অঞ্চলে একসময় প্রবেশ ঘটে একদল ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ, জলানুসন্ধানবিদ, জরিপকারীর দলের। কিন্তু, মাকোন্দোবাসী তাতে বিচলিত হয়না। কেননা তারা অবাক হয়ে কেবল মাকোন্দোয় ট্রেনের পত্তন আর যোগাযোগের এই বস্তুর মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের (ফরাসি, তুর্কি, কৃষ্ণাঙ্গ) আগমণ লক্ষ্য করে যায়। বিজাতীয়দের জন্য এখানে ফ্রান্সের রমণীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত বেশ্যাপল্লী তৈরি করা হয়, তুর্কী অধ্যুষিত জায়গাটিতে পাওয়া যায় বিদেশি জিনিসপত্রে ঠাসা দোকানপাটের আধিক্য, আবার ওয়েস্ট ইন্ডিয়ার শান্তিপ্রিয় কৃষ্ণাঙ্গরা তাদের বসবাসকৃত জায়গায় অগোছাল উচ্চারণে ধর্মসংগীতের আয়োজন করে। এমন সব বিচিত্র সংস্কৃতি, পরিবেশ, উপকরণ মাকোন্দোর মধ্যে সন্নিবেশিত হতে থাকে।

বুয়েন্দিয়া পরিবারের ফ্যান্টাসিময় যাপিত জীবনের সাথে ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের বাস্তবতাকে হাজির করা হয়েছে চকিত সময় বদলের নৈপুণ্যের মতো। ম্যাজিক রিয়েলিজমে এরূপ বাস্তব, ফ্যান্টাসি, উদ্ভবের মিশ্রণ দেখা যায়। মাকোন্দোর মতো শান্তিপ্রিয় মানুষের বিশ্বাসকে পুঁজি করে ঔপনিবেশিক প্রভুদের শোষণধারা প্রতিষ্ঠিত করার প্রসঙ্গটি মার্কেজ স্মৃতির ডানায় ভর করে, ঠাকুমার কাছে গল্প শোনার ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন।

চার

কলা যুদ্ধ (১৮৯৮-১৯৩৪) লাতিন আমেরিকার ইতিহাসের সাথে জড়িত একটি বিষাদময় অধ্যায়। আমেরিকান ফল কোম্পানি লাতিন আমেরিকা, ক্যারিবীয় অঞ্চল, কলম্বিয়া, কিউবা প্রভৃতি অঞ্চল হতে তরমুজ, আখ, কলা সহ বিভিন্ন ফল আমদানি করে জ্যাম, জেলির রপ্তানি করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। একসময় দেখা যায়, ফল উৎপাদনকারী অঞ্চলের মানুষগুলোর প্রতি অমানুষিক আচরণ শুরু করে বহুজাগতিক কোম্পানিগুলো। নিপীড়িত মানুষগুলো তাদের দাবী দাওয়া পেশ করলে, কৌশলে তাদেরকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয় অত্যাচারী শাসকেরা। কলা কোম্পানির আগমন, কলা যুদ্ধের পরিণতির সাথে মাকোন্দোর ইতিহাসকে এক সুতোয় গেথেছেন গার্সিয়া মার্কেজ।

মি. হার্বার্ট নামের এক বিদেশি যখন ট্রেনযোগে মাকোন্দোয় এসে পৌঁছায়, তখন অরেলিয়ানো সেগান্দো তার স্বভাবতই বিজাতীয় এই ভদ্রলোককে বাড়িতে নিয়ে আসে। অথিতি আপ্যায়নে তাকে কলা খেতে দেওয়া হলে , সুস্বাদু কলার পুরো ছড়াটা শেষ করার পর সে উৎসাহী হয়ে আরেকটি ছড়া আনতে বলে। উরসুলার বাড়িতে বসে কলা নিয়ে সে ব্যাপক পরিক্ষা-নিরিক্ষা (তুলাদণ্ডে ওজন নেয়, ক্যালিপার্সে কলার প্রস্থ মাপে, তাপমাত্রা, বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ, আলোর তীব্রতা) চালায়। দেখা যায়, তার কিছুদিন পরেই মাকোন্দোয় আবির্ভাব ঘটে কৃষিবিদ, ইঞ্জিনিয়ার, আবহাওয়াবিদের। পরবর্তীকালে, মাকোন্দোয় স্থাপিত হয় কলা কোম্পানি। ডি. ব্রাউনের *"আমারে কবর দিও হাঁটুভাঙ্গার বাঁকে"* বইতে দেখা যায়, রেড ইন্ডিয়ানরা কলম্বাসকে অতিথি মান্য করে তাদের ভূখণ্ডে স্থান দিলেও কিছুকাল পরে কলম্বাস সেখানে কলোনি গড়ে তোলে, তাদেরকে উচ্ছেদের ব্যবস্থা করে, ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে এবং প্রদর্শনীর জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠায়। শেষ পর্যন্ত, নিজ ভূখণ্ডে রেড ইন্ডিয়ানরা অবাঞ্ছিত আগন্তুক হয়ে যায়। মাকোন্দোয় কলা কোম্পানি স্থাপন এবং কলা যুদ্ধের যে করুণ ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে সেটির সাথে রেড ইন্ডিয়ানদের ইতিহাস একই সূত্রে গাথা।

মাকোন্দোয় সাধারণ মানুষেরা প্রথমেই কলা কোম্পানির বিরুদ্ধে তীব্র কোনো আন্দোলনে অংশগ্রহণের সাহস অর্জন করেনি। শুরুর দিকে তারা রবিবারকে সাপ্তাহিক ছুটির দিন হিসেবে কর্তৃপক্ষের কাছে শান্তিপূর্ণ ভাবে আবেদন

করে। সাধারণ এই আবেদনটি গৃহীত না হলে, তাদের মধ্যে চাপিয়ে রাখা দীর্ঘদিনের ক্ষোভ বেরিয়ে আসে। ক্রমে তাদের ন্যায্য দাবিগুলোর সংখ্যা বর্ধিত হয়। কলা কোম্পানির সাধারণ শ্রমিকেরা কেবল তাদের সাপ্তাহিক ছুটির মধ্যে নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ না করে পর্যাপ্ত স্যানিটারি সুবিধা, চিকিৎসার ব্যবস্থা, কাজের পরিবেশকে মানসম্মত করা, ঠিক সময়ে বেতন পরিশোধ করা, রসিদ বাদ দিয়ে টাকায় বেতন-প্রভৃতির দাবিতে আন্দোলন করে। মাকোন্দোর মতো শান্তিপূর্ণ জায়গায় এমন অশান্তির পরিবেশ ছিলো মাকোন্দোবাসীর কাছে নতুন। বিদ্রোহীরা কোম্পানির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ধরে দাবি-দাওয়ার অনুলিপিতে সই করিয়ে নিলে বিচারকের সামনে কোম্পানি তা অস্বীকার করে। পরিস্থিতি যখন রক্তাক্ত আর গৃহযুদ্ধের দিকে ধাবিত হচ্ছে, তখন কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের একত্রিত হতে বলে। দেখা যায়, অরেলিয়ানো সেগান্দো বিদ্রোহী শ্রমিকদের সাথে যোগ দিয়ে স্টেশনে উপস্থিত হয়। কিন্তু, শাসকগোষ্ঠী তাদেরকে ধোঁকা দিয়ে আন্দোলনকে অযৌক্তিক হিসেবে আখ্যা দেয় এবং চলে যাবার হুকুম দেয়- "ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, পাঁচ মিনিট সময় দেয়া গেল আপনাদেরকে এখান থেকে চলে যাওয়ার জন্যে সেই একই সুরে ক্যাপ্টেন বলে ওঠে, 'পাঁচ মিনিট পার হয়ে গেছে। আর এক মিনিট, তারপরেই আমরা গুলি ছুঁড়তে শুরু করবো।"[১০]

বলা বাহুল্য, শাসকশ্রেণি সাধারণ মানুষের উপর নির্বিচারে গুলি চালায় যেখানে শিশু, নারী, বৃদ্ধ, কিশোর- এদের কাউকেই তোয়াক্কা করা হয়নি। শাসকেরা অতি শীঘ্রই রক্তের দাগ মুছে ফেলে তাদের ক্ষমতার জোরে। মাকোন্দোর স্টেশনের সাথে লাগানো বড় মাঠে প্রায় তিন হাজার গুলিবিদ্ধ লাশকে রাতের মধ্যেই সমুদ্রে ফেলার ব্যবস্থা করে শাসকেরা। এছাড়া জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ঘোষণায় তারা বলে যে, কলা শ্রমিকেরা শান্তিপূর্ণ ভাবে বাড়ি ফিরে গেছে, কেননা, কোম্পানির সাথে তাদের শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এই গণহত্যার একমাত্র সাক্ষী হিসেবে আমরা অরেলিয়ানো সেগান্দোকে পাই, যে কিনা বুলেটের গুলি থেকে প্রাণে বেঁচে যায় ভাগ্যক্রমে। তাকে তো কলা যুদ্ধের বীভৎসতা থেকে বাঁচতেই হতো, কেননা তার বিড়বিড় করা শব্দরাজির মধ্যেই কেবল কলা যুদ্ধের সত্যতা লুকিয়ে আছে, "হোসে আর্কাদিও সেগান্দো শুধু বলে, 'ওখানে তিন হাজারেরও বেশি লোক ছিল। আমি এখন নিশ্চিত, স্টেশনের সবাই ছিল ওখানে।"[১১]

কলা কোম্পানি প্রতিষ্ঠা, কলা যুদ্ধের বর্ণনা ম্যাজিক রিয়েলিজমের আঙ্গিককে ঘিরে রচিত। ঐতিহাসিক দিক থেকে কলা যুদ্ধের সত্যতা পাওয়া যায়। আমেরিকান কলা কোম্পানি 'ইউনাইটেড ফ্রুট' লাতিন আমেরিকার স্থানীয় অধিবাসীদের দাস বানিয়ে বিপুল অর্থ উপার্জন করে। একসময় স্থানীয়রা সোচ্চার হলে 'ইউনাইটেড ফ্রুট' কোম্পানি তিন হাজারেরও বেশি লোককে হত্যা করে। যুগে যুগে ঔপনিবেশিক শাসন তার খোলস বদলালেও মূল ভিত্তি একই থাকে। ফলে, কলা কোম্পানির মতোই ভারতবর্ষে শোষণের চিত্র দেখা যায় 'নীল বিদ্রোহ'তে। জাদু বাস্তবতায় লেখক যে ক্ষমতাবঞ্চিত মানুষের লড়াইকে দেখান, মাকোন্দোর কলা যুদ্ধ তেমনি উপনিবেশিত অঞ্চলের মানুষের লড়াই। তিন হাজারেরও বেশি ভাগ্যাহত মানুষের করুণ পরিণতি সম্পর্কে পাঠকের আরও জানার আগ্রহ থাকলেও, মার্কেজ সে বিষয়ে আলোকপাত না করে ভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন পরের পরিচ্ছেদে। এক প্রসঙ্গ থেকে আরেকপ্রসঙ্গে রূপকথার গল্পের মতো চলে যান মার্কেজ। কিন্তু, এর মূলে ইতিহাসের চরম সত্যতা লুকিয়ে আছে। জাদু বাস্তবতায় লেখক মানব আচরণের বিচিত্র রহস্যের স্বরূপের মধ্য থেকে পাঠককে প্রয়োজনীয় সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করান। মাকোন্দো থেকে শাসকশ্রেণি বিদ্রোহীদের নাম-নিশানা মুছে ফেললেও, হোসে আর্কাদিও সেগান্দোর কথাকে মাকোন্দোবাসী অপ্রাসঙ্গিক মনে করলেও, আপাতদৃষ্টিতে এই অবাস্তব, কল্পিত ঘটনায় পাঠক সত্যকে উপলব্ধি করে।

পাঁচ

পিলার তারনেরার সাথে বুয়েন্দিয়া পরিবারের যৌনতার সম্পর্ক স্থাপিত হয় উরসুলার বড় সন্তান হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়ার মাধ্যমে, এটি অব্যাহত থাকে কয়েকটি প্রজন্ম ধরে। একটি পার্চমেন্টের অর্থোদ্ধারের পেছনে উরসুলার স্বামী হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া থেকে শুরু হয়, তার সমাপ্তি হয় অরেলিয়ানোর শূকরের লেজ সহ সন্তান জন্মদানের মাধ্যমে। বুয়েন্দিয়া পরিবারে বিশ্বাস ছিলো যে, একই জ্ঞাতির(একই রক্তের ভাই বোন বা অজাচার সম্পর্ক স্থাপিত হয় এমন কারোর সাথে)মধ্যে বিয়ে হলে তাদের সন্তানেরা শূকরের লেজ নিয়ে জন্মাবে। এই বিশ্বাসের কারণে উরসুলা

নিজেকে আবদ্ধ করে রেখেছিল তার স্বামীর কাছ থেকে, কেননা তারা একই জ্ঞাতির ছিলো। পার্চমেন্টের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলো জোড়া দিয়ে অরেলিয়ানো দেখে যে, তার পূর্ববর্তী যারা পাঠোদ্ধারের কাজে হাত দিয়ে মাঝপথে হাল ছেড়ে দিয়েছিল, তাদের মধ্যে অযোগ্যতা বা উদ্যমের অভাব ছিলোনা কাজটি করার জন্য, বরঞ্চ তাদের চেষ্টা তখন ছিল অসময়োচিত। অরেলিয়ানো আরও আবিষ্কার করে যে, আমারান্তা উরসুলা তার বোন নয়, খালা। যার সাথে অন্তরঙ্গ হবার ফলে পৌরাণিক জন্তুটির জন্ম হয়, বুয়েন্দিয়া বংশের ইতি টানার জন্য। এই অজাচারের ব্যাপারেই উরসুলা তার বংশের লোকদেরকে বারবার সতর্ক করেছিল। গার্সিয়া মার্কেজ এইভাবেই লাতিন আমেরিকার লোকবিশ্বাসকে হাজির করেছেন কাহিনির গাথুনিতে। ম্যাজিক রিয়েলিজমে যৌনতাকে খুব স্বাভাবিকভাবে দেখা যায়। ফলে, পিলার তারনেরার সাথে বুয়েন্দিয়াদের সাতটি প্রজন্মের যৌনতার সম্পর্ককে স্বাভাবিকভাবেই দেখানো হয়েছে। মার্কেজের লেখায় বুয়েন্দিয়া বংশ ধ্বংসের মূল কারণ অবাধ যৌনতা। *খোয়াবনামা*'য় বিমাতার সাথে তমিজের যৌনতার সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়। এমনকি ম্যাজিক রিয়েলিজমের যোগসূত্র আছে এমন অন্যান্য রচনাতেও (অলীক মানুষ, কুবেরের বিষয় আশয়) যৌনতা অনিবার্যভাবেই এসেছে। প্রাত্যহিক কাজকর্মের মতোই যৌনতাও যে স্বাভাবিক বিষয়, সেটিই ম্যাজিক রিয়েলিজমে বিবেচনা করা হয়।

ছয়

মাকোন্দোর ইতিহাসে দীর্ঘ সময়ের বৃষ্টির দেখা যায়। এই বৃষ্টির স্থায়িত্ব ছিলো চার বছর, এগারো মাস, দুই দিন। বর্ষণের এই দীর্ঘ সময়টিতে বুয়েন্দিয়া পরিবারের সদস্যদের কার্যকলাপ, পরিস্থিতির মাধ্যমে গার্সিয়া মার্কেজ যেন মাকোন্দোর সামগ্রিক চিত্রটি তুলে ধরতে চেয়েছেন। তিন মাস খরার পর যখন প্রথম বৃষ্টিপাত শুরু হয় তখন মাকোন্দোবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। প্রথমে তারা বৃষ্টি উপভোগ করে, কিন্তু পরবর্তীকালে বৃষ্টিপাত তাদেরকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। চারিদিকে শ্যাওলা জন্মে স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশে গৃহবন্দী থাকা মাকোন্দোবাসীর মধ্যে সর্বপ্রথম দেখা দেয় খাদ্য সংকট। অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া তার নিজের পরিশ্রম আর সৌভাগ্যের জোরে অফুরন্ত খাবারের ভাণ্ডার তৈরি করলেও প্রবল আর দীর্ঘস্থায়ী বৃষ্টিতে তাদের ভাঁড়ার ঘরে বেঁচে ছিলো মাত্র তিন পাউণ্ড শুকনো মাংস আর এক বস্তা চাল। খাদ্যের অভাবে ফারনান্দার ক্ষোভ আর অপমানে সে ঘরের মধ্যে ধ্বংসযজ্ঞ চালায়, শেষপর্যন্ত শুকনো মাংসের কয়েকটা ছড়া, কয়েক বস্তা চাল, গুবরেপোকাওলা শস্য, শুকিয়ে যাওয়া কয়েক ছড়া কলা নিয়ে হাজির হলে তারপর থেকে বুয়েন্দিয়া পরিবারে খাদ্যের আর অভাব হয় না।

প্রায় পাঁচ বছর ধরে চলতে থাকা বৃষ্টির ফলে কলা কোম্পানি যেখানে তাদের সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল সেই জায়গাটি হয়ে যায় পচতে থাকা শেকড় বাকড়ের জলামাত্র। কলা কোম্পানির ধ্বংসযজ্ঞের পর মাকোন্দোর পরিবেশকে নির্মল করার জন্য দীর্ঘদিনের এই বৃষ্টি যেন অপরিহার্য ছিলো। প্রায় পাঁচ বছর ধরে চলতে থাকা অতিবর্ষণের কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি না থাকলেও, এই অতিবাস্তব প্রেক্ষাপটের প্রয়োজন ছিল। 'ইউনাইটেড ফ্রুট' কোম্পানির বিরুদ্ধে মাকোন্দোবাসীর যুদ্ধ করার সামর্থ্য ছিলনা। ফলে, মার্কেজ প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশ্রয় নিয়ে কলা কোম্পানির বীভৎসতা থেকে মাকোন্দোকে প্রতিহত করেছেন, যা কিনা জাদু বাস্তব। মাকোন্দোর দীর্ঘদিনের বৃষ্টির সমাপ্তি ঘটেছে ঠিক এভাবে, "এক শুক্রবার দুপুর দুটোর সময় ইটের গুঁড়োর মতো রুক্ষ আর প্রায় পানির মতো ঠাণ্ডা টকটকে লাল একটা সূর্য দুনিয়াটাকে আলোয় ভাসিয়ে দিয়ে উঠে আসে, তারপর দশ বছরেও আর বৃষ্টির মুখ দেখা যায় না।"[১২]

সাত

লাতিন আমেরিকায় ঔপনিবেশিক শাসকেরা বিভিন্ন অঞ্চলে রাণী বা সুন্দরী প্রতিযোগিতার আয়োজন করতো। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সেইসব সুন্দরী কালের গহ্বরে হারিয়ে যেত। মাকোন্দোর মতো ক্ষুদ্র অঞ্চলের সাথে ঔপনিবেশিক শাসকদের এই অনালোচিত অধ্যায়টিকে জুড়ে দিয়েছেন গার্সিয়া মার্কেজ। লাতিন আমেরিকা যে যে পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে গেছে তার কোনোটিকেই যেন পাশ কাটিয়ে যেতে চাননি মার্কেজ। লাতিন আমেরিকার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় সমূহ হাজির হয়েছে গার্সিয়া মার্কেজের তুলির আঁচড়ে। ফারনান্দা দেল কার্পিও নামে এক তরুণীর প্রবেশ ঘটে মাকোন্দোতে,

মাদাগাস্কারের রাণী বানানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে লিবারেল পার্টির লোকেরা মাকোন্দোয় নিয়ে আসে। পান্নার মুকুট আর নকুলের চামড়ার হাতছাড়া কোট পরা, আর বালাচুড়ি ও ক্রেপ কাপড় দ্বারা পরিবেষ্টিত কিশোরীটি যেন সত্যিকারের রাণীর মতোই সজ্জিত। ফলে, মাকোন্দোবাসী তাকে এক নজর কাছে দেখার জন্য হল্লা করে। আবার, অন্যদিকে লিবারেল পার্টির উটকো ঝামেলার মধ্যে দিশেহারা হয়ে পড়া রাণীকে উদ্ধার করে অরেলিয়ানো সেগান্দো। উরসুলা তাকে নিজের কন্যার মতো সেবা-যত্ন করে। পরবর্তীকালে, অরেলিয়ানো সেগান্দো তাকে বিয়ে করে।

কিন্তু, অধিকাংশ রাণী বা সুন্দরী খেতাব প্রাপ্ত নারীই পরিবার থেকে পৃথক হয়ে পরে বিয়ে সংসার হয়না তাদের, একসময় তারা হারিয়ে যায়। পরিবার কিংবা আশেপাশের লোকেরা তাদেরকে কালক্রমে ভুলে যায়। বুয়েন্দিয়া পরিবারের একজন সুন্দরীকে আমরা পাই, তার রূপের দীপ্তিতে মাকোন্দো যেন আলোকিত হতো। সুন্দরী রেমেদিওসের রূপের অনলে তাড়িত হয়ে তার জানালার সামনে প্রায় প্রতিদিনিই মৃত মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়। জীবনকে সহজ করার জন্য সে যেসব উপায় অবলম্বন করতো সেগুলো তাকে সাধারণের চেয়ে ভিন্ন করে তুলতো, বলা বাহুল্য পুরুষকে আরও বেশী করে আকর্ষণ করতো। কাপড়-চোপড় পড়ার ঝামেলা এড়ানোর জন্য সে একটা মোটা কাপড়ের আলখেল্লা বানিয়ে কেবল মাথার ওপর দিয়ে সেটা গায়ে চাপিয়ে বাড়িতে ঘুরে বেড়ায়; এতে তার নগ্ন থাকার অনুভূতি যেমন একদিকে বজায় থেকেছে অন্যদিকে তার কাপড় পড়ার ঝামেলাটাও মিটে যায়। প্রতিদিন মাথা আঁচড়ানোর ঝামেলা এড়ানোর জন্য রেমেদিওস তার মাথাটা কামিয়ে ফেলে সেই কাটা চুলগুলো দিয়ে পরচুলা বানিয়ে ফেলে। দেখা যায়, যতই সে সহজ-সরল জীবন যাপন করার চেষ্টা থেকে সাজসজ্জা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে / গতানুগতিকতা এড়িয়ে চলে, ততই তার সৌন্দর্য পুরুষের কাছে উত্তেজক হয়ে ওঠে। তার শরীর থেকে উত্তেজনাকর হাল্কা সুবাস ছড়ায় যা তার পাণিপ্রার্থীদের মজ্জার ভিতরে প্রবেশ করে তাদের অস্থির করে তোলে। সুন্দরী রেমেদিওসকে যখন মাকোন্দোর রানী হিসেবে ঘোষণা করা হয়, তখন নাতনির আশঙ্কাজনক সৌন্দর্যতে আঁতকে ওঠা উরসুলাও এই নির্বাচনটা আটকাতে পারেনা। সুন্দরী রেমেদিওসের শেষ পরিণতি হয় জীবিত অবস্থায় প্রকাশ্য দিবালোকে ঊর্ধ্বাকাশে মিলিয়ে যাওয়া। ঔপন্যাসিক লিখেছেন:

> ...... সেই আলোর করুণার হাতেই চাদরগুলো ছেড়ে দিয়ে সে দেখতে থাকে সুন্দরী রেমেদিওস হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে যাচ্ছে পতপত করতে থাকা চাদরগুলোর ভেতর থেকে, সেগুলো তারই সঙ্গে মর্তভূমি ছেড়ে এসেছে,তারই সঙ্গে ছেড়ে যাচ্ছে ঝিঁ ঝিঁ পোকা আর ডালিয়া ফুলের পরিবেশ, তারই সঙ্গে বাতাস কেটে চলে যাচ্ছে বিকেল চারটা বাজতে না বাজতে, আর সেই চাদরগুলো চিরদিনের জন্যে তার সঙ্গে আরো উপরের সেই বায়ুমণ্ডলে হারিয়ে যায় যেখানে যাওয়ার সাধ্য স্মৃতির সবচেয়ে ঊর্ধ্বগামী পাখিদেরও নেই। [১৩]

গার্সিয়া মার্কেজ সুন্দরী রেমেদিওসের এই পরিণতিকে উপস্থাপন করেছেন ম্যাজিক রিয়েলিজমের মাধ্যমে। সাধারণ মানুষ সরাসরি আকাশে মিলিয়ে যেতে পারেনা, রেমেদিওসের এই অকস্মাৎ মিলিয়ে যাওয়া দ্বারা মার্কেজ যেন লাতিন আমেরিকায় সুন্দরী তরুণীদের নিখোঁজ হবার প্রসঙ্গকে বোঝানোর প্রয়াস করেছেন। লাতিন আমেরিকার ঔপনিবেশিক প্রভুরা কৌশলে বিভিন্ন অঞ্চলের সুন্দরীদেরকে গুম করে ফেলতো সেই প্রসঙ্গ ম্যাজিক রিয়েলিজমের মাধ্যমে দেখিয়েছেন মার্কেজ। রেমেদিওসের যে সৌন্দর্যের বর্ণনা মার্কেজ দিয়েছেন তাতে তাকে মর্ত্যের নারীর চাইতে রূপকথার রাণী বলে মনে হয়। ম্যাজিক রিয়েলিজমে রূপকথার এরূপ অলৌকিক প্রসঙ্গকে হাজির করা হয় বাস্তবতাকে বোঝার জন্য।

আট

"হাজার দিনের যুদ্ধ"(১৮৯৯-১৯০৩) কলম্বিয়ায় সংঘটিত একটি গৃহযুদ্ধ যেখানে উদারপন্থী ও রক্ষণশীলেরা অংশগ্রহণ করেছিল, ব্যাপক সম্পদহানি হয়, জাতীয় অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পরে, একইসাথে ৬০,০০০-১৩০,০০০ জন সাধারণ ও বিদ্রোহী মানুষ প্রাণ হারায়। রক্ষণশীল সরকার অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক যে জুলুম প্রবর্তন করেছিল কলম্বিয়ায় তার বিরুদ্ধে মাথাচারা দিয়ে উঠে উদারপন্থী পার্টি। ১৮৯৯ সালে প্রথম যুদ্ধ শুরু হলেও সাত মাসের ব্যবধানে উদারপন্থী বাহিনীর পরাজয়ের মাধ্যমে তা প্রাথমিকভাবে শেষ হলেও পরবর্তী আড়াই বছরেও বিদ্রোহ চলেছিল তবে, সেগুলো ছিল অসংগঠিত অনেকটা গেরিলা শ্রেণির(সেগুলো মূল শহর থেকে দূরে, গ্রামীণ এলাকায় সংঘটিত হতো)।

কিন্তু, দেখা যায় এই অঞ্চলগুলোতে যুদ্ধ আর রোগ ভোগের কারণে কেবল সম্পত্তি আর প্রাণহানিই ঘটতো। পরিশেষে, রক্ষণশীল সরকার সামরিক কৌশল, কারাদণ্ড, জরিমানা, বিদ্রোহীদের সম্পত্তি বায়েজাপ্ত করার করার মাধ্যমে আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণে আনে। গার্সিয়া মার্কেজ কলম্বিয়ার এই ইতিহাসকে মাকোন্দোর সাথে একীভূত করে উপস্থাপন করেছেন। রক্ষণশীল আর উদারপন্থীদের লড়াইয়ের সাথে কর্নেল আরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার ভাগ্যকে জুড়ে দিয়ে মাকোন্দোর ইতিহাসকে পাঠকের কাছে আরোও বাস্তবসম্মত করেছেন।[১৪]

নয়

নিঃসঙ্গতার একশ বছর উপন্যাসে ছড়ানো-ছিটানো আছে নিঃসঙ্গতার নানা উপাদান। মাকোন্দোর বুয়েন্দিয়া পরিবারকে ঘিরে রচিত এই উপন্যাসে চরিত্ররা একই পরিবারের হলেও একজন আরেকজনের কাছ থেকে যেন যোজন যোজন দূরে অবস্থিত। কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়াকে আমরা পাই চরম নিঃসঙ্গ মানুষ হিসেবে। ৩২ টি সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তার সবকটিতে হেরে গিয়ে সে কামারশালায় বন্দী জীবন কাটায়, সোনার মাছ বানিয়ে সেগুলো বিতরণ করে দেয় সাধারণ মানুষের মধ্যে। সরকার তাকে আমরণ অবসর ভাতা দিতে চাইলে সে ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখান করে। উদারপন্থী আর রক্ষণশীলদের যে লড়াই লাতিন আমেরিকায় শুরু হয়েছিলো সেটি 'হাজার দিনের যুদ্ধ' হিসেবে পরিচিত। অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া উদারপন্থী আর রক্ষণশীলদের এই লড়াইয়ে ক্রমশ জড়িয়ে যায়। তার শ্বশুর রেমেদিওসের বাবা সরকারি কর্মকর্তা হবার কারণে তিনি রক্ষণশীলদের পক্ষাবলম্বন করেন, অন্যদিকে অরেলিয়ানো তার পরোপকারী স্বভাবের কারণে উদারপন্থীদের সমর্থন করে। নির্বাচনের আগে রক্ষণশীল ও উদারপন্থীদের প্রচারণা চালানো হয় মাকোন্দোয়। ঔপন্যাসিক লিখেছেন:

> উদারপন্থীরা হল ফ্রিম্যাসন, বদলোকজন, পাদ্রীদের তারা ফাঁসীতে ঝোলাতে চায়, প্রবর্তন করতে চায় সিভিল ম্যারেজ আর বিবাহ বিচ্ছেদ, বৈধ সন্তানের সমান অধিকার দিতে চায় জারজ সন্তানকে, আর চায় দেশটাকে একটা ফেডারেল পদ্ধতিতে ভাগ করতে যা কিনা কর্তৃপক্ষের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেবে। অন্যদিকে রক্ষণশীলরা, যারা ক্ষমতা পেয়েছে সরাসরি ঈশ্বরের কাছ থেকে, তারা চায় গণশৃঙ্খলা আর পারিবারিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে দেশটাকে স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যে টুকরো টুকরো করে ফেলতে দিতে রাজি নয় তারা।[১৫]

মাকোন্দোতে সামরিক আইন জারি হয়ে গেলে অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া তার বাল্যকালের বন্ধু জেরিনালদো মার্কেসকে সৈন্য জোগাড় করতে বলে, কিছুদিনের ভিতরেই তারা উন্মত্ত হামলা চালিয়ে সেনাছাউনি দখল করে ফেলে ,অত্যাচারী সেনাপ্রধানদের হত্যা করে, অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেয়। উদারপন্থীদের লক্ষ্যের সাথে একত্রিত হয়ে মাকোন্দো ত্যাগ করেছিল অরেলিয়ানো, তারপর সময় বুঝে বিভিন্ন অঞ্চলে তার নেতৃত্বে ৩২ টি যুদ্ধ সংঘটিত হয় , যার সবকটিতেই সে হেরে যায়। তার মত নির্ভীক চিত্তের মানুষের যথাযথ উত্তরসূরি তৈরির জন্য বিভিন্ন ক্যাম্পে অবস্থানকালে সুন্দরি যুবতিদের পাঠানো হত। ফলে দেখা যায়, সতেরো জন আলাদা রমণীর গর্ভে সতেরোটি পুত্র সন্তান হয় অরেলিয়ানোর কিন্তু তারা ৩০ বছরের বেশি বাঁচে না, কেননা সরকার তাদের জন্মপরিচয় অনুসন্ধান করে তাদেরকে হত্যা করে ফেলে।

দশ

ম্যাজিক রিয়েলিজমের অন্যতম প্রয়োগ দেখা যায় আমারান্তার মৃত্যুকে ঘিরে। রেবেকার প্রতি আজীবন ঘৃণা পুষে রাখা আমারান্তা নিজের মৃত্যুকে নারী রূপে (পিলার তারনেরার মতো) দেখতে পায়। গার্সিয়া মার্কেজ বিষয়টিকে হাজির করেন এভাবে:

> মৃত্যুকে দেখতে পায় সে বারান্দায় তার নিজের সঙ্গে সেলাইরত অবস্থায়। দেখতে পায় তার কারণ সে ছিল নীল পোশাক পরা লম্বা চুলের এক নারী অবশ্য মৃত্যু তাকে বলেনি কখন সে মারা যাবে বা রেবেকার আগে তার ঘন্টা বাজবে কিনা, তবে সে তাকে নির্দেশ দিয়েছিল সামনের ছয়ই এপ্রিল তার নিজের কাফনের কাপড় বোনা শুরু করার যেদিন সে কাপড় বোনা শেষ করবে সেদিনই সন্ধ্যেবেলা কোনোধরনের ব্যথা-বেদনা, ভয়-ভীতি কিংবা তিক্ততা ছাড়াই মারা যাবে সে।[১৭]

আমারান্তা তার মৃত্যুর দূতের কথামতো নিজের কাফনের কাপড় বুনতে শুরু করে দেয়, কাপড় সেলাইয়ের শেষ ফোঁড়টা যেদিন সে দেয় সেদিন তার মৃত্যুর ঘোষণা প্রকাশ্যে আনে, ফলে মাকোন্দোয় এযাবতকালে যারা মারা গিয়েছে

তাদের পরিবারের লোকেরা মৃতদের কাছে চিঠিপত্র পৌঁছানোর জন্য আমারান্তাকে বাহক হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। অন্যদিকে, আমারান্তাও প্রেরকদের আশ্বস্ত করে তার কর্তব্যের কথা বলে যায়। সকালবেলায় সে ছুতোরমিস্ত্রি ডেকে নিজের পছন্দমতো কফিন বানানোর নির্দেশ দেয়, সন্ধ্যেবেলায় সে সদ্য তৈরিকৃত কফিনে শুয়ে চল্লিশ বছর পর প্রথমবারের মতো আয়নায় নিজের মুখ দেখে আর অবাক হয়ে যায় কারণ এতোদিন নিজের যে ছবি মনের মধ্যে এঁকেছে সেটি আয়নার সাথে হুবহু মিলে গেছে। রেবেকার সাথে বিবাদের পর থেকে হাতে কালো পট্টিবাঁধা অবস্থাতেই চিরনিদ্রায় শায়িত হয় আমারান্তা বুয়েন্দিয়া। লাতিন আমেরিকার মিথ, রূপকথা, ইতিহাসকে এইভাবেই গার্সিয়া মার্কেজ মাকোন্দোর সাথে জুড়ে দিয়েছেন জাদু বাস্তবতার মোড়কে।

এগারো

একই বংশের সন্তানেরা যেমন বেড়ে ওঠার পারিপার্শ্বিকতার গুণে ভিন্ন রূপ পায়, তেমনি লাতিন আমেরিকা ও ভারতীয় ম্যাজিক রিয়েলিজম একই বংশজ হলেও, তাদের প্রকৃতি ও রূপরেখা স্বাভাবিকভাবেই ভিন্ন। খনিজ ও কৃষিজাত সম্পদে সমৃদ্ধ লাতিন আমেরিকার উপর ইউরোপীয় শক্তিশালী জাতির অপূরণীয় লোভ, শোষণে-পীড়নে নিঃশেষিত করেছিল অস্ত্রশক্তিহীন সরলমনস্ক মানুষদের। এই অমানবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে মার্কেজ গ্রহণ করেছেন ঠাকুমার কাছ থেকে শোনা স্বপ্ন, মিথ, রূপকথা নির্ভর ম্যাজিক রিয়েলিজমকে। অন্যদিকে, ঔপনিবেশিক শাসনে জর্জরিত ভারতীয় উপমহাদেশে জাদুবাস্তবতার প্রকৃতি খানিকটা ভিন্ন। দুইশো বছরের ইংরেজ শাসনের ফলে ভারতবর্ষের অলি-গলিতে ঔপনিবেশিকতার অভিশাপ বহন করে চলেছে। ঔপনিবেশিক প্রভুদের পাশ্চাত্য জ্ঞান, সভ্যতা শিক্ষার মশাল জ্বালানোর নামে যে অভিনয় করেছিল, তার সবটাই পচে-গলে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল কদর্য মুখশ্রী। পরবর্তীকালে, দেশভাগ সংঘটিত হবার ফলে শাসকগোষ্ঠীর পরিবর্তন হলেও শাসন ও শোষণধারা অব্যাহত থাকে। ফলে, ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, সিপাহি বিদ্রোহ কিংবা ফসলের তেভাগার লড়াই, মুসলিম লীগ-কংগ্রেসের স্বার্থবাদী রাজনীতি অথবা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা- প্রভৃতি ঘটনাবলি ম্যাজিক রিয়েলিজমের ভিত্তিতে উপস্থাপন করেছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্বে এসে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ফকির-সন্ন্যাসি বিদ্রোহের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত মুনসি বয়তুল্লা শাহকে হাজির করেছেন। কোম্পানির বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে নিহত মুনসি বয়তুল্লার অশরীরী উপস্থিতি পুরো *খোয়াবনামা* জুড়ে আছে। মুনসির সাথে তমিজের বাপের সখ্যতায় শরাফত মণ্ডল সহ শাসকগোষ্ঠীর অন্তরে এক ধরনের ত্রাসের সঞ্চার করেছেন । ম্যাজিক রিয়েলিজমে যে অব্যাখ্যাত, অজানা আতঙ্কের উপস্থিতি দেখা যায় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মুনসির অশরীরী উপস্থিতি এবং তমিজের বাপের সাথে তার সখ্যতা। ঔপন্যাসিক বলেছেন:

> বন্দুকের গুলিতে ফুটো গলা তার আর পুরট হলো না। মরার পর সেই গলায় জড়ানো শেকল আর ছাইভস্মমাখা গতর নিয়ে মাছের নকশা আঁকা লোহার পান্টি হাতে সে উঠে বসলো কাৎলাহার বিলের উত্তর সিথানে পাকুড়গাছের মাথায়। সেই তখন থেকে দিনের বেলা রোদের মধ্যে রোদ হয়ে সে ছড়িয়ে থাকে সারাটা বিল জুড়ে। আর রাতভর বিল শাসন করে ওই পাকুড়গাছের ওপর থেকেই।[১৭]

আশির দশকে বাংলা সাহিত্যে রদবদলের পালা দেখা যায়, যার অনেকগুলো কারণের মধ্যে স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা অন্যতম। রাজনৈতিক পালাবদলের এই আবহাওয়ায় মানুষের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের সুযোগ না থাকায় সাহিত্যিকেরা বাধ্য হয়েছিলেন নতুন সাহিত্যিক আঙ্গিককে গ্রহণ করতে। আশির দশকে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, শহিদুল জহির সহ প্রখ্যাত সাহিত্যিকেরা ম্যাজিক রিয়েলিজমের প্রয়োগ ঘটান বাংলা সাহিত্যে। একটা বিশেষ পরিস্থিতি, বিশেষ সময়কে ঘিরে পাশ্চাত্যের আবরণকে ভেদ করে বাংলা অঞ্চলে প্রবেশ ঘটে জাদু বাস্তবতার।

গার্সিয়া মার্কেজের *নিঃসঙ্গতার একশ বছরে*'র সমান্তরালে আমরা চিন্তা করতে পারি আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *খোয়াবনামা* উপন্যাসটিকে। ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ থেকে শুরু করে তেভাগা আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ রদ, মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের রাজনীতি, এরই সাথে ভেসে উঠেছে ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা মানুষের সাথে প্রান্তিক মানুষের জীবন সংগ্রাম। মার্কেজের আখ্যানকে যদি আমরা লাতিন আমেরিকার নিখাদ গাঁথুনি হিসেবে আখ্যায়িত করি তাহলে *খোয়াবনামা*'কে উত্তরবঙ্গ তথা গোটা বাংলার একটা সামগ্রিক ছবি হিসেবে বিবেচনা করতে পারি, কেননা তমিজদের কখনো মৃত্যু

হয়না, উচ্চবর্গের শোষণেরও কোনো সীমারেখা থাকেনা, শাসক ও শোষিতের এই অভেদ্য ও অমীমাংসিত লড়াই যেন দেশে দেশে কালে কালে ধ্রুবকের ভূমিকা পালন করে।

খোয়াবনামা আমরা মোটা দাগে ক্ষমতাবঞ্চিত মানুষের জীবনলেখ্য বলতে পারি, যেখানে খেয়েপড়ে বেঁচে থাকাই মানুষের দায় হয়ে পড়ে, ধোঁয়া ওঠা গরম ধবধবে সাদা ভাত হয়ে উঠে কারোর জীবনের পরম আরাধ্য তপস্যা। তমিজ, কুলসুম, তমিজের বাবাকে ঘিরে গড়ে ওঠা এই আখ্যানে খোয়াবনামা নামক এক পুরাতন বইকে ঘিরে কাহিনির সূত্রপাত। *খোয়াবনামা* মূলত স্বপ্নের ব্যাখ্যাতা এক জীর্ণশীর্ণ বই যেখানে বিভিন্ন আঁকিবুকি, হেঁয়ালির মাধ্যমে স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। কুলসুম তার দাদার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে এই বই পেয়েছে। স্বপ্নের ব্যাখ্যায় যা বিবেচ্য সেগুলোকে ছাপিয়ে এখানে স্বপ্নদেখা মানুষগুলো প্রধান হয়ে উঠেছে। তমিজের স্বপ্ন ফসলের তেভাগার, তার ঔরসজাত সন্তান সখিনার স্বপ্ন বলকানো ভাতের, ফুলজান কুলসুমের স্বপ্ন খেয়ে পড়ে বাঁচার, তেভাগার কবি কেরামত নিজের বাঁধানো গানের মাধ্যমে চায় খ্যাতি, শরাফত মণ্ডলের হাত থেকে কাৎলাহার বিলের মালিকানা নিজের নামে করার স্বপ্নে বিভোর কালাম মাঝি, মুসলিম লীগে নিজের অবস্থানকে পাকাপোক্ত করতে চায় কাদের ,এসব স্বপ্ন ছড়ানো আছে চরিত্রগুলোর চিত্রপটে।

বারো

ম্যাজিক রিয়েলিজমে লেখক মানব আচরণ বা প্রকৃতিতে খুঁজে চলেন এক লুকানো ক্ষমতাশক্তি ; ফলে চেরাগ আলী ফকির আর তার নাতনি কুলসুমের মধ্যে আমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়ার এক বিচিত্র ক্ষমতা দেখতে পাই, আবার তমিজের বাপের সাথে কাৎলাহার বিলের উত্তর সিথানে পাকুড়গাছের মাথায় থাকা মুনসির সখ্যতাকে বিলপাড়ার মানুষেরা স্বাভাবিক ভাবেই মেনে নেয়:

সিথানে পাকুড়গাছ মুনসির বসতি।
তলায় গজার মাছ অতি হিংস্রমতি।।
গভীর নিশিতকালে মুনসির আদেশে।
বিলের গজার মাছ রূপ লয় মেষে।[১৮]

ফকির মজনু শাহের সাথে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির টেলারের সংঘর্ষে প্রাণ হারায় মুনসি বয়তুল্লা শাহ। এই মুনসির মৃত্যুকে ঘিরে কাৎলাহার বিল সংলগ্ন এলাকায় অতিপ্রাকৃত বিষয়ের অবতারণা দেখা যায়। এই অব্যাখ্যাত বিষয়কে কেন্দ্র করে লেখক যেন এক সত্যের মুখোমুখি নিয়ে যেতে চান ।

তমিজের বাপের সাথে মুনসির যোগসূত্র বিলপাড়ায় সর্বজনবিদিত, লোকমুখে প্রচারিত যে, তার শক্তি আসে পাকুড় গাছ থেকে। তমিজের বাপের আধোজাগরণ অবস্থা, ঘুমের মধ্যে কাৎলাহার বিলের দিকে হাঁটাচলা, ঝিমিয়ে থাকার মধ্যেও সে বাস্তব থেকে বিচ্যুত নয়। আধপাগল এই মানুষটি নিজেদের অধিকার জিইয়ে রাখতে শরাফত মণ্ডলের মতো উচ্চবিত্তের মোকাবেলা করে কাৎলাহার বিলে জাল ফেলে শেষে লাঞ্ছিত হয়। ইতিহাসের সাক্ষী পাকুড় গাছটিকে নিধন করে মণ্ডলের ছেলে সেখানে ইটভাটা চালু করে চোরাবালির রথে করে মুনসির সহচর হয়ে কালের গহ্বরে হারিয়ে যায় তমিজের বাপ। কিন্তু, তমিজ হার মানতে চায় না। ফকির-সন্ন্যাসি বিদ্রোহের পর থেকেই কাৎলাহার বিলে মাঝিরাই মাছ ধরে জীবিকা চালাত, পরবর্তীকালে শরাফত মণ্ডলের মতো শাসকেরা বিলের মালিকানা নিলে মাঝিরা তাদের চিরায়ত পেশা ছেড়ে কৃষিকাজ করতে শুরু করে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে কৃষিকাজেও তারা শোষণের স্বীকার হয়। বর্গাচাষ করে সারাবছর ধরে নিজের সন্তানের মতো লালিত স্বপ্নকে শেষমেশ তুলে দিতে হয় মালিকের গোলায়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃষকদের এই দুরাবস্থায় *বঙ্গদেশের কৃষক* প্রবন্ধে বলেন:

> আমরা দেখাইলাম, এই ঈশ্বরপ্রেরিত কৃষিধনের বৃদ্ধির ভাগ, রাজা পাইয়া থাকেন, ভূস্বামী পাইয়া থাকেন, বণিক পায়েন, মহাজন পায়েন কৃষী কি পায়? যে এই ফসল উৎপন্ন করে সে কি পায়? আমরা এমত বলি না যে, সে কিছুই পায় না। বিন্দু বিসর্গমাত্র পাইয়া থাকে। যাহা পায় তাহাতে তাহার কিছু অবস্থার পরিবর্তন হয় নাই। অদ্যাপি ভূমির উৎপন্নে তাহার দিন চলে না। অতএব যে সামান্য ভাগ কৃষকসম্প্রদায় পায়, তাহা না পাওয়ারই মধ্যে। যার ধন, তার ধন নয়। যাহার মাথার কালঘাম ছুটিয়া ফসল জন্মে, লাভের ভাগে সে কেহ হইল না।[১৯]

কৃষক শোষণ কালে কালে রূপভেদে পরিবর্তিত হলেও মূলে যে একই থাকে তার প্রমাণ হিসেবে আমরা তমিজকে পাই, যে কিনা ফসলের তেভাগার জন্য লড়াইয়ে শামিল হয়েছে। জেলের সন্তান হয়েও জীবিকার তাগিদে যখন বর্গাচাষে যোগ দিয়েছে তখন তার উৎপন্ন ফসলের প্রায় সবটুকুই উঠেছে মালিকের গোলায়। রক্তজল করে ফলানো ফসল যায় মালিকের উদরে অন্যদিকে তার মেয়ে স্বপ্ন দেখে গরম ধোঁয়া ওঠা ভাতের। একদিকে, তমিজ বিলের মাছ ধরার অপরাধে মামলার আসামী হয় অন্যদিকে, নব উদ্যমে আবারও বর্গাচাষ করার শক্তি তার নেই কারণ শোষিত হবার ভয়, ফলে সে ফসলের তেভাগার লড়াইয়ে পা বাড়ায়। শরাফত মণ্ডলের হাত থেকে কাৎলাহার বিলের মালিকানা কালাম মাঝির কাছে হস্তান্তর হলেও মাঝিপাড়ার মানুষের শোষণ অব্যাহত থাকে। কালাম মাঝি তার মাঝি নাম বিকিয়ে মাঝিপাড়ার নিম্নবর্গের মানুষদেরকে জোঁকের মতো নিঃশব্দে রক্ত শুষে যায়। তমিজের ভিটামাটির মতো অনেক মাঝির ভিটামাটি, মাছ ধরার জাল, নৌকা তার কব্জায়। কুলসুমের প্রতি তার যৌনতার নগ্ন বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়, কিন্তু কুলসুম তাকে প্রতিহত করলে বটির কোপে লাশ হতে হয় আর সব দায় কৌশলে তেভাগার কবি কেরামতের উপরে দেয়। ক্ষমতাবানেরা চিরকালই অপরাধ করে ফাঁক-ফোকর দিয়ে বেরিয়ে গেলেও তাদের অন্তরে এক ধরনের ভয়কে বিদ্যুতের ঝলকের মতো হঠাৎ করেই হাজির করেছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। মাটিতে কিলবিল করা তিনটে শিঙি মাছ যখন কুলসুমের চুলের ভেতর ঢুকে যাবার চেষ্টা করে তখন সেগুলোকে সাপের মতো মনে হয় কালাম মাঝির:

> এটা কি শিঙ্গিমাছ? নাকি আজকেই হুরমতুল্লার ঘরে দেখা সেই গোখরাটা? কিংবা তার জোড়া? কাৎলাহার বিলের এপারে ওপারে সব জীবের মতো এটাও তো মুনসির শাসনেই থাকে। তমিজের বাপ, বৈকুণ্ঠ, সেই কোন আমলের মুনসি, চেরাগ আলি ফকির, এদের সঙ্গে এসে জুটলো হুরমতুল্লার বাড়ির গোখরাটা । কাৎলাহারের সব মরা জীবের ভয়ে, তাদের সহকর্মী এই গোখরা সাপের ভয়ে কালাম মাঝি আরো জোরে চেপে ধরে কুলসুমের মুখ।[২০]

ম্যাজিক রিয়েলিজমে যে সুবিধা বঞ্চিত শ্রেণির লড়াই দেখা যায় উচ্চবর্গের বিপরীতে তমিজ যেন তারই প্রতিভূ। গায়েত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক তাঁর *Can The Subaltern Speak* প্রবন্ধে বলেন:

> Within the effaced itinerary of yhe subaltern subject, the track of sexual difference is doubly affected. The question is not of femal participation in insurgency, or the ground rules of the sexual division of labor, for both of which there is 'evidence. 'It is, rather, that, both as object of colonialist historiography and as subject of insurgency, the ideological construction of gender keeps the male dominant. If, in the context of colonial production, the subaltern has no history and cannot speak, the subaltern as female is even more deeply in shadow…..[২১]

নিম্নবর্গের যে নিজস্ব কোনও স্বর নেই, উচ্চবর্গ তাদের ওপর ভিন্ন স্বর চাপিয়ে দেয় সেটি গায়েত্রী চক্রবর্তীর পাশাপাশি আখতারুজ্জামান ইলিয়াসও দেখাতে চেয়েছেন। তমিজদের উপরে ভাগ্যদেবতা সুপ্রসন্ন থাকেন না কোনো কালেই, ফলে কঠিন জীবনের আলেখ্য আমরা কেবল দূর থেকে দেখতে পাই, অথচ দুর্গম জীবনকে সংগ্রামের ভেতর দিয়ে পাড় করে যায় নিম্নবর্গের মানুষেরা। জসীম উদ্‌দীন এই বিষয়টিকে অবলম্বন করে বলেন:

> মাঠের রাখাল, বেদনা তাহার আমরা কি অত বুঝি;
> মিছেই মোদের সুখ-দুখ দিয়ে তার সুখ-দুখ খুঁজি।[২২]

রূপাইয়ের বেদনাকে কেবল দূর থেকে দেখার আক্ষেপ বোঝা যায় কবির ভাষ্যে। আবার, নিম্নবর্গের স্বরকে, তাদের অভিব্যক্তিকে, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সাহিত্যে তুলে আনার জন্য কাজী নজরুল ইসলাম তাদের ভাষায় সাহিত্য (পাঁচালী/পুথি সাহিত্য,জারির গান, গাজির গানের আদলে) রচনার কথা বলেছেন। শহরের বাবুয়ানা ভাব পরিত্যাগ করে নিম্নবর্গের জীবনকে রূপায়িত করতে গেলে, তাদের সাথে কাদামাটিতে যেতে হবে, শহরের খোলস পরিত্যাগ করে। অধস্তন শ্রেণির মধ্যে আমির হামজা, সোনাভান, আলিফ লায়লা, কাসাসোল আম্বিয়া প্রভৃতি পাঠের চল ছিল। ফলে, এইসব সাহিত্যের ভেতর দিয়েই তাদের অধিকার আদায়, শোষণ-অবদমনের বিষয়ে, নিজেদের মাস্টারি ভাব লুকিয়ে শিক্ষা দেবার কথা বলেন, "আজকাল আমাদের সাহিত্য বা সমাজ-নীতি সবই টবের গাছ। মাটির সাথে সংস্পর্শ নেই। কিন্তু জনসাহিত্যের জন্য জনগণের সাথে যোগ থাকা চাই। যাদের সাহিত্য সৃষ্টি করব, তাদের সম্বন্ধে না জানলে কী করে চলে?"[২৩]

তেরো

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বগুড়ার বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকা ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করেছেন মিথ, লোকবিশ্বাস, হেঁয়ালি, লোকছড়া - প্রভৃতি অকৃত্রিম উপাদানগুলো, যেগুলোই মূলত *খোয়াবনামা'*র অস্থিমজ্জায় প্রাণের সঞ্চার করেছে। অধস্তন শ্রেণির প্রতিনিধি হলেও তমিজের বাপকে সামন্ত প্রভুরা ভয়ের চোখে দেখে, স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেবার ক্ষমতা শুধু তাদেরই আছে, টেলরের গুলিতে নিহত মুনসির সাথে তার যোগসূত্রকে মাঝিপাড়া-কামারপাড়ার লোকজনের সাথে সাথে সামন্ত শ্রেণিও সমীহ করে চলে। মণ্ডলের ছেলের সম্বন্ধিকে কলকাতায় দাঙ্গার সময় খুন করা হলে তমিজের বাপ মাটিতে নানারকম দাগ কেটে তার জীবিত হবার সংবাদ ঘোষণা করে, এমনকি সে অমাবস্যার সময় মুনসির সাহায্যে তার বর্তমান অবস্থানেরও জানান দিতে সক্ষম।

দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, মুসলিম লীগের স্বার্থবাদী রাজনীতির মারপ্যাচে মাঝিপাড়া-কামারপাড়ার মানুষের বিপর্যস্ত জনজীবনকে হাজির করার পাশাপাশি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রাজনৈতিক জটিলতাগুলোকে দেখিয়েছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। দেখা যায়, দেশভাগের ফলে শহরে হিন্দুদের পরিত্যক্ত ভালোভালো বাড়িগুলো একদল মানুষ নিজেদের দখলে নিয়ে ফেলছে, আবার গ্রামে শরাফত মণ্ডলের মতো সামন্তপ্রভু আকাল, রোগব্যাধির কারণে দেশত্যাগী সাধারণ মানুষের পরিত্যক্ত জমিগুলো নিজের দখলে নিয়ে সম্পদের পাহাড় গড়েছে। যার ফলে, ধনীরা আরোও অর্থবিত্তের মালিক হয় অন্যদিকে অধস্তন শ্রেণি দারিদ্রসীমার তলানির দিকে যেতে থাকে। শ্রেণিদ্বন্দ্ব, বৈষম্যমূলক সমাজের একপ্রান্তে থাকে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পুথিগত বিদ্যার বুলি আওড়ানো রাজনৈতিক সমগ্রতার প্রত্যাশা, অন্যপ্রান্তে অধস্তন শ্রেণির খেয়ে-পড়ে বাঁচার বিপর্যস্থ লড়াইয়ে রাজনৈতিক বুলির নিরর্থকতা। মুসলিম লীগ যে জমিদারদের সংগঠন নয়, সৈয়দ আমীর আলীর *স্পিরিট অফ ইসলাম*-এর নিহিতার্থ কিংবা বাংলার সাথে আরবি-ফারসি-উর্দু মিশেল ভাষা (হাজেরান মজলিশ, নারায়ে তকবির, লড়কে লেঙে, কায়েদে আজম) মাঝিপাড়া-কামারপাড়া গ্রামের সাধারণ মানুষের বোধগম্য না হলেও কেরামত আলির গানের কথাগুলো তাদের অন্তরাত্মায় করাঘাত করে:

চাষার মেন্নতের দাম খালি আকাম জোতদারেরই কাছে।
দুই মাস গেলে চাষা ঘোরে মহাজনের পাছে॥ জোতদার মহাজনে
জোতদার মহাজনে মনে মনে উহাদের পিরীত।
চাষার মুখের গেরাস খাওয়া দুইজনেরই রীত॥ চাষার বড়ো দুষমন
চাষার বড়ো দুষমন এই দুইজন যেমন পাখির দুষমন খাঁচা।
চোরের দুষমন চান্দের পহর পোকের দুষমন প্যাঁচা॥ রাবণের দুষমন ॥
রাবণের দুষমন ভাই বিভীষণ রামের অনুচর।
ধর্মেরে করিল বরণ অধর্মেরে পর ॥ দেহের দুষমন
আর দেহের দুষমন ভেদবমন গাছের দুষমন লতা।
চাষার দুষমন জমিদার জোতদার অতি লেয্য কথা॥ বলি জমিদারি
ব অ লি জমিদারি উচ্ছেদ করি এমন আইন চাই।
জোতদার পাবে এক ভাগ ফসল চাষায় দুই ভাগ পাই॥ তাই তেভাগার ডাক
তা ই তেভাগার ডাক দাও জোরে হাঁক বলো চাষার জয়।
চাষা বিনা জগৎ মিছা সব্বজনে কয়। দেখো বর্মণী মায়ে
আহা বর্মণী মায়ে পুলিসের ঘায়ে হইয়াছে জখম।
পায়ে গুলি খাইয়াও বুকের বল তো নাহি কম॥ সকল চাষীজনে
চাষীমজুরনে নাহি মানে জোতদারের জুলুম।
চাষীর রক্তে জোতদার বাঁচে সকলের মালুম॥[২৪]

শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহের বাণী উচ্চারণ করার ক্ষমতা তেভাগার কবি কেরামতের নেই, কিন্তু গানের মাধ্যমে সে এক দিকে শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধাচারণ করেছে অন্যদিকে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। তার গানের সাথে বৈকুণ্ঠ সহ মাঝিপাড়ার অনেকেই মৃত চেরাগ আলী ফকিরের (খোয়াবনামার আসল মালিক সে, অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী) সংলগ্নতা অনুভব করে। ইলিয়াস যেন শতবছরের লাঞ্ছিত মানুষগুলোকে একই সুতোয় গেঁথে কেরামতের গানের মাধ্যমে অধিকার আদায়ের কথা বলেছেন। জয়পুরহাট, পাঁচবিবি, আক্কেলপুর,

আমোদদিঘি, হিলি, শান্তাহার প্রভৃতি জায়গায় গান গেয়েছে, গানের বই বিক্রি করেছে, যেখানে চাষা-জোতদার-তেভাগার কথাই বিবৃত, তমিজের তেভাগার স্বপ্নের ভিত্তি ভূমি তৈরি করেছে কবি কেরামত আলী। পারফরমিং আর্টের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছাকাছি যাওয়া যায়- যেটিকে ব্যবহার করে মুসলীম লীগের নেতা-কর্মীরা প্রচারণা চালায়, তেভাগার গানকে তারা মুসলিম লীগের প্রোপাগান্ডা হিসেবে চালাতে চায়। মুসলিম লীগের স্বার্থবাদী রাজনীতি চর্চার জলজ্যান্ত প্রমাণগুলো হাজির করেছেন ঔপন্যাসিক। নির্বাচনের প্রচারণার অংশ হিসেবে মণ্ডলের ছোট ছেলে কাদের প্রাণপণে চেষ্টা করে যায় ইসমাইলের প্রিয়ভাজন হয়ে মুসলিম লীগে নিজের জায়গা করে নিতে আবার, নেতা হিসেবে আসা ইসমাইল, অজয় দত্ত গিরিরডাঙা ও নিজগিরিরডাঙায় অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির চর্চা করলেও দলের বিভিন্ন সভা-সমাবেশে সাম্প্রদায়িকতার উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রদান করে। ঔপন্যাসিক বলেছেন:

> পাকিস্তানে মুসলমানের চাকরির কোনো অসুবিধাই হবে না। কেবল মুসলমান হবার অপরাধে সরকারি চাকরি থেকে তাদের বঞ্চিত হতে হবে না। তারপর হিন্দু শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা মুসলমানদের ধর্ম নিয়ে, তাদের তাহজির তমদ্দুন নিয়ে ব্যঙ্গ করে, বিদ্রুপ করে, তাদের বইপুস্তকে মুসলমানদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। তাদের সঙ্গে আমরা থাকতে পারি না। পাকিস্তানে শাসন চলবে কোরান আর সুন্না অনুসারে, শাসকদের জীবনযাপন হবে ইসলামের খলিফাদের মতো। তারা টুপি সেলাই করে আর কোরান নকল করে যা রোজকার করবে, তাতেই তাদের খাওয়াদাওয়া চালাতে হবে।[২৫]

মাঝিপাড়া-কামারপাড়ার মানুষদের মনে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প প্রবেশ করতে থাকে এই ধরনের কথাবার্তার প্রেক্ষিতে, যার ফলাফল গিয়ে ঠেকে কামারপাড়ায় আগুন দেবার মাধ্যমে। শহরে দাঙ্গার ফলে মুসলমান-হিন্দু একে অন্যকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখে, সুযোগ পেলেই একে-অন্যকে নৃশংসভাবে খুন করতে পিছপা হয়না, শহরে রিফিউজি ক্যাম্প স্থাপিত হয়। স্তন কাটা এক মেয়ের বর্ণনা পাওয়া যায়, বিহারের হিন্দুরা তাকে সম্ভোগের পর একটি স্তন কেটে ফেলায় রিফিউজি ক্যাম্পে তার রিলিফের ভাগটা একটু বেশি। কেরামত রিফিউজি ক্যাম্পের এই মেয়েটির মুখটিকে কুলসুমের সাথে গুলিয়ে ফেলে বেদনায় মুষড়ে যায়। অবস্থা-পরিবেশকে পাশ কাটিয়ে শোষিতরা যেন এক কাতারে দাঁড়িয়ে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব অনুভব করে সেটি দেখাতে চেয়েছেন ইলিয়াস। আবার, এসব ক্যাম্পে অনুদান দিতে আসে কামারপাড়ায় আগুন লাগানোর মূল হোতা মণ্ডলের ছেলে কাদের। যার লাগানো আগুনে কামারপাড়ার যুধিষ্ঠির দগ্ধ হয়ে মারা যায়, সাথে তার চাষাবাদের গরু দুটিও প্রাণ হারায়; অধিকাংশ কামারপাড়ার সাধারণ মানুষ অর্থনৈতিক-শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় সাম্প্রদায়িকতার এই বিষবাষ্পে।

চৌদ্দ

ম্যাজিক রিয়েলিজমে স্মৃতি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, অতীতের এই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্বাসযোগ্য দলিলের উপর ভিত্তি করে এই আখ্যান গড়ে ওঠে। *নিঃসঙ্গতার একশ বছর* উপন্যাসের সূচনা স্মৃতির উপর ভিত্তি করে দেখা যায়, ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার মনে পড়েছে ছোটবেলার কথা, যেখানে আছে জিপসিদের বিভিন্ন উদ্ভাবনীর কথা, সেইসাথে মাকোন্দোর ক্রমপরিবর্তন। আবার, *খোয়াবনামা*'য় দেখা যায় লেখক স্মৃতির সাহায্যে সুদূর অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে নির্দ্বিধায় ধাবিত হয়েছেন। ম্যাজিক রিয়েলিজমে সময়ের ধারাবাহিকতাকে ভেঙে ফেলা হয়। ফলে, কাৎলাহার বিলে তমিজের বাপের মেঘ তাড়ানোর গল্প থেকে লেখক চলে যান সুদূর অতীতে- এতই অতীত যে তখনও তমিজের বাপ বা তার বাপের জন্ম হয়নি কিংবা সেপাইদের গুলিতে মারা যায়নি মুনসি বয়তুল্লা। এরই দুই/তিন বছর পরে চোরাবালিতে ডুবে তমিজের বাপের মৃত্যুর আগাম বার্তার মাধ্যমে লেখক পুরো প্রেক্ষাপটকে নিয়ে যান ভবিষ্যতের দিকে। ফলে দেখা যায়, টেলরের গুলি খেয়ে গোটা কাৎলাহার বিলে রাজত্ব করা মুনসিকে দেখার লোভে রাত-বিরাতে তমিজের বাপের অস্বাভাবিক হাঁটাচলার যে আখ্যানের সূত্রপাত ঘটেছে *খোয়াবনামা*'য় , এটি যেন ঠাকুমার কাছে গল্প শোনার মতোই উৎসাহব্যঞ্জক। ম্যাজিক রিয়েলিজম এইরূপ রূপকথা উপকথাকে পুঁজি করে আখ্যানভূমি গড়ে তোলে।

নিঃসঙ্গতার একশ বছরে'র কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার সাথে যদি *খোয়াবনামা*'র তমিজকে পাশাপাশি চিন্তা করি তাহলে দেখা যাবে যে, তমিজের চিন্তা-ভাবনা প্রাগ্রসর। কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া ৩২ টি সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে ঠিকই কিন্তু এক সময়ে তার উপলব্ধি হয়েছে সে কেবল নিজের অহংকারের জন্য যুদ্ধ করেছে, যুদ্ধের

প্রকৃত অর্থ তার কাছে ধোঁয়াশা। ৩২ টি সশস্ত্র যুদ্ধে হেরে গিয়ে, সরকারের দেওয়া ভাতা প্রত্যাখ্যান করে, কামারশালায় সোনার মাছ তৈরি করে বন্দীজীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে কর্নেল অরেলিয়ানো কেবলই নিজের মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। অন্যদিকে, তমিজ উচ্চবর্গের দ্বারা শোষিত হয়ে থেমে থাকে নি; তেভাগার দাবীতে পা বাড়ায় আন্দোলনের দিকে। অরেলিয়ানো যেখানে হতাশায় নিমজ্জিত তমিজ সেখানে আশায় বুক বেঁধেছে। হোসে আর্কাদিওর সাথে তমিজের বাপের অনেকখানি মিল পাওয়া যায়। এরা জীবনকে দার্শনিক দৃষ্টিতে দেখেছে। তাদের অসংলগ্ন কথাবার্তা/আচরণের ভেতর দিয়ে এক অমোঘ সত্য উন্মোচিত হয়। তমিজের বাপের সাথে মুনসির যোগসাজশের ফলে নিম্নবর্গের অবদমিত স্বর উত্থিত হয়, একইসাথে হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া মেলকিয়াদেসের(জিপসি) সাথে একত্রিত হয়ে মাকোন্দোয় বসে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানাবিধ প্রান্ত (পৃথিবী গোল, ধাতু ও বরফের ব্যবহার)আবিষ্কার করে।

পিলার তারনেরার সাথে বুয়েন্দিয়া পরিবার যৌনতার সূত্রে গাঁথা। পরিবারের প্রথম সন্তান থেকে শুরু করে বেশকয়েকটি প্রজন্মের যৌনতার সূচনা তাকে ঘিরেই। এরইসাথে হাত দেখার অলৌকিক ক্ষমতা তার, কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার হাত দেখে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল বাস্তবেই এর যথার্থতা দেখা গিয়েছিল কর্নেলের জীবনে। *খোয়াবনামা*'র কুলসুমের মধ্যেও যৌনতা আছে তবে সেটি তার কাছে অবদমিত। তমিজের বলিষ্ঠ ও সুঠাম শরীরের বিপরীতে তমিজের বাপের প্রায় ভগ্ন শরীর তাকে মানসিকভাবে পীড়া দিলে একসময় সে আশ্রয় গ্রহণ করে তমিজের শরীরের। *খোয়াবনামা* ইতিবৃত্তান্তের সাথে ওতপ্রেতভাবে জড়িয়ে আছে চেরাগ আলী ফকিরের নাতনি কুলসুমের নামটি। স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেবার অলৌকিক গুণ তার মাঝে বিদ্যমান, যার ফলে উচ্চবিত্তও তার ওপর নির্ভর করে। ম্যাজিক রিয়েলিজমে যে অতিপ্রাকৃত, অব্যাখ্যাত বা অলৌকিক বিষয়ের অবতারণা দেখানো হয়, পিলার তারনেরা ও কুলসুমের মধ্যে সেই অতিরহস্যের বিষয়গুলো দেখা যায়।

তমিজের মেয়ে সখিনা পায় পুথির সন্ধান। সেই একই পুথির প্রসঙ্গ পাই *নিঃসঙ্গতার একশ বছরে*'র মধ্যে যা কিনা জিপসি জাদুকর মেলকিয়াদেস সঁপে দিয়েছিল বুয়েন্দিয়া পরিবারের কাছে আর চতুর্থ অরেলিয়ানোর যেটির মর্মোদ্ধার করতে পেরেছিল। এই সেই পুথি, যা কেরামত আলি উলটেপালটে দেখেছিল। বইয়ের পাতা ওলটায় আর কেরামত আলি দেখে কোনোখানে কোনো শোলোকই নাই। খাকি রঙের কাগজে বইয়ের মলাট সেলাই করা, সেখানে কার কাঁচা হাতের লেখা খাবনামা, ফালনামা ও তাবির।

খোয়াবনামা এক ইতিহাস যেখানে ধরা পড়েছে তেভাগা-আন্দোলন, বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ব্যবস্থা, ঠিক সেরকমই *নিঃসঙ্গতার একশ বছরে* ধরা পড়েছিল কলাচাষিদের কষ্ট, শোষণ আর বিদ্রোহের গল্প লাতিন আমেরিকার পরিপ্রেক্ষিতে। উপন্যাস দুটি শেষ করার পরেও পাঠক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে থাকে নায়কই বা কে আর প্রতিনায়কই বা কে। এখানেই ম্যাজিক রিয়েলিজমের সার্থকতা। সাধারণভাবে ম্যাজিক রিয়েলিজমের ধারায় চোরাস্রোত থাকে রাজনীতি, থাকে শোষণ আর সামাজিক বৈষম্য। ফলে, *খোয়াবনামা*'য় মুনসিকে দেখার আশায় পথ হেঁটে চলে তমিজের বাপ। এই ফ্যান্টাসি চরিত্রের সন্ধানে ঘুমের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে তমিজের বাপ চোরাবালিতে পড়ে তলিয়ে যায়। মরার আগে সে দেখতে পায় মুনসিকে, আর দেখতে পায় পুড়ে-যাওয়া পাকুড়গাছ। চোরাবালিতে সেঁধিয়ে যায় নামহীন, পরিচয়হীন কত তমিজের বাপ দুবেলা পেটভরে ভাত খাবার স্বপ্ন দেখতে দেখতে। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, তমিজের বাপের কোনো আইডেন্টিটি নেই, সে স্বপ্ন আহরণ করতে ব্যস্ত ভালো করে ভাত খাবার স্বপ্নে। বাংলার দারিদ্র কপর্দকশূন্য কৃষকশ্রেণি ফসল ফলিয়েও মারা যায় দুমুঠো ভাতের স্বপ্ন দেখতে দেখতে। কিন্তু, তার উত্তরাধিকারী সখিনার আইডেন্টিটি আছে। এই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে যাবতীয় জ্ঞান, সংস্কার ও সর্বোপরি এক নতুন পৃথিবীর হস্তান্তরের চিত্র দেখা যায়, ঠিক এই ছবি আমরা পাই একশ বছরের নিঃসঙ্গতা'য়। মাকোন্দোয় জিপসিদের আগমন, বিশ্বের বিভিন্ন আধুনিক সুযোগ-সুবিধার সাথে, যন্ত্রপাতির সাথে, আবিষ্কারের সাথে পরিচিত হয় মাকোন্দোবাসী। দেখা যায়, সর্বশেষ প্রজন্ম অরেলিয়ানো ব্যাবিলনিয়া পর্যন্ত এই জ্ঞান ও সংস্কার প্রবাহিত হয়। যেখানে এক জিপসির দূর্বোধ্য ভাষায় লেখা বই পায় এবং অর্থ উদ্ধারে সমর্থ হয় লাতিন আমেরিকার এক প্রত্যন্ত গ্রামের চতুর্থ অরেলিয়ানো। স্বাধীনতা-উত্তর তৃতীয় বিশ্বের কৃষিজীবী গ্রামবাসীর যেমন ছিল না কোনো আইডেন্টিটি। আখতারুজ্জামান নিজেই বলছেন, প্রত্যেক গ্রামগুলোতে একটা না একটা মিথ আছে, ভূত কিংবা জিন থাকে। সেটা আমি বিশ্বাস করি কি না করি তাতে

কিছু যায়-আসে না। আমি তো ইতিহাস লিখতে বসিনি। যদি এটা বেশি বাস্তব হয়ে থাকে, এটা জীবনেরই একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমাদের জীবন তো স্বপ্নের মধ্য দিয়েই কাটছে।

ইতিহাস আর ম্যাজিক ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে উপন্যাস দুটিতে। ফলে, অবদমিত বা ভাগ্যাহত শ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া, হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়া, কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া অথবা তমিজের বাপ, তমিজ, কুলসুম যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে জাদু বাস্তব আলোচনায়।

লাতিন আমেরিকার ইতিহাস, ভূগোল, মিথকে একই সুতোয় গেঁথেছেন মার্কেজ অন্যদিকে ভারতবর্ষের প্রায় ২০০ বছরের ছোট থেকে বড় প্রায় সমস্ত ঘটনার সন্নিবেশ ঘটেছে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের রচনায়। প্রেক্ষাপট, পরিবেশ আলাদা হলেও উভয় রচনায় একই রকম মানসিকতা লেখকদের মধ্যে কাজ করেছে, তা হলো সত্য উন্মোচন। ম্যাজিক রিয়েলিজমে অবাস্তব-রহস্য-অলৌকিকতার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়েই পাঠক সত্যের মুখোমুখি উপস্থিত হয়ে যান।

তথ্যনির্দেশ

১। রহমান, হাবিব আর (সম্পা.), (ফেব্রুয়ারি ২০১৪)। *পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব : ধ্রুপদী ও আধুনিক*। কথাপ্রকাশ, ৩৮/৩ কম্পিউটার কমপ্লেক্স (৩য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০। পৃ. ২৬২

২। চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল (২০২১)। *জাদুবাস্তবতার তত্ত্বভাবনা ও বাংলা সাহিত্য*। JOCAS (Journal of Commerce Arts and Science), Volume:4, Issue:1 December, 2021

৩। পূর্বোক্ত, Volume:4

৪। সাজ্জাদ, সুমন (২০১১)। *প্রকৃতি, প্রান্তিকতা ও জাতিসত্তার সাহিত্য*। আবহমান প্রকাশনী লিমিটেড, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯। পৃ. ৪২

৫। দাশ, জীবনানন্দ। *কবিতাসমগ্র* (বনলতা সেন)। বাদল ব্রাদার্স,৩৮/4, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, পৃষ্ঠা-১১৬

৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র (জানুয়ারি ২০১৩)। *বাস্তবের কুহক কুহকের বাস্তব*। প্রতিভাস, , পৃষ্ঠা-৬৪

৭। মার্কেজ, গাব্রিয়েল গার্সিয়া , সাক্ষাৎকার সংগ্রহ, উৎপল ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কবিতীর্থ-২০১৬

৮। হাবীব, জি. এইচ, (অনু.), (২০০০)। *গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ* (১৯৬৭)। *নিঃসঙ্গতার একশ বছর*। সন্দেশ প্রকাশনী, ১৩৮৩/৮/এইচ, নতুনবাগ, রামপুরা, ঢাকা- ১২১৯। পৃ. ১২৬

৯। পূর্বোক্ত, পৃ.২০৪

১০। পূর্বোক্ত, পৃ.২৭১

১১। পূর্বোক্ত, পৃ.২৭৮

১২। পূর্বোক্ত, পৃ.৩৬৪

১৩। পূর্বোক্ত, পৃ.২৯২

১৪। পূর্বোক্ত, পৃ.২১৫

১৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫২

১৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬

১৭। পূর্বোক্ত, পৃ.২৪৯

১৮। ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান (১৯৯৬)। *খোয়াবনামা*। দীপ প্রকাশন, ২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা- ৭০০ ০০৬। পৃ. ১৩

১৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ৯

২০। চট্টপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, (১৮৮৭) বিবিধ প্রবন্ধ (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ), বঙ্গদেশের কৃষক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২৪৩। ১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা- ৬। পৃ. ২২৪

২১। পূর্বোক্ত, পৃ.৩৩৬

২২। স্পিভাক, গায়েত্রী চক্রবর্তী (১৯৮৮)। *Can the Subaltern Speak*?, পৃ. ২৮

২৩। উদ্‌দীন, জসীম (১৩৩৬ইং ১৯২৯)। *নক্সী কাঁথার মাঠ*। পলাশ প্রকাশনী, ১০ কবি জসীম উদ্‌দীন রোড, ঢাকা- ১২১৭। পৃ. ৩৪

২৪। ইসলাম, নজরুল কাজী, (১৯৩৮)। *দৈনিক কৃষক পত্রিকা* (জন সাহিত্য সংসদের শুভ উদ্বোধনে সভাপতি কাজী নজরুল ইসলামের প্রদত্ত অভিভাষণ), কলিকাতা ৫ নং ম্যাঙ্গো লেন, পৃ. ২১৩

২৫। পূর্বোক্ত, পৃ.১৬৭